কিশোরদের রূপকথা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা-১২

ঋণ-শোধ

সে অনেক—অনেকদিন আগেকার কথা। তারপর কত শত-সহস্র বর্ষা গাছের পাতায় নেচে ফিরে গেছে! কত নতুন নগরী জেগে উঠেছে তাদের সৌধমালা, তাদের ঐশ্বর্যের গর্ব নিয়ে! আবার কত প্রাচীন শহর তাদের সমস্ত প্রাচীন গৌরব নিয়ে বালুকারাশির মধ্যে ডুবে গেছে! কত নদী শুকিয়ে গেছে, কত নদী পথ-ভুলে হারিয়ে ফেলেছে তাদের প্রাচীন গতিপথ!

সত্যি,—তারপর প্রায় দেড় হাজার বছর কেটে গেছে।

সে এক ক্ষত্রিয় রাজকুমার। বাল্যকালেই সে স্বপ্ন দেখতো—তার বাহুবলে তার পিতার ক্ষুদ্র রাজ্যের সীমা বহু নদী, বহু গিরিপথ পার হয়ে সুদূর গান্ধার থেকে কলিঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। দিকে দিকে তার প্রজা, দেশে দেশে তার প্রতিনিধি। আরও স্বপ্ন দেখতো যে, সে যেন রাজসূয় যজ্ঞ করছে, ভারতের বিখ্যাত দেশগুলির প্রবল-প্রতাপশালী রাজারা পূজা পাঠিয়েছেন তার রাজসূয় যজ্ঞ সম্পূর্ণ করার জন্যে!

কিন্তু শুধু স্বপ্ন দেখতে ভাল লাগলো না তার। দেশগুলো কেমন, কার কত শক্তি, কার সৈন্যবল কত, এসব জানতে হবে তাকে। নইলে দিগ্বিজয়ে বেরুবে কেমন করে সে?

অবশেষে কৌতূহল যখন আর চেপে রাখতে পারল না, তখন সে তার সমবয়সী দশ-বারজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে একদিন শিকারের নাম করে বেরিয়ে পড়ল দেশ-ভ্রমণে।

রাজ্যের সীমা পার হয়ে একটি চাকরকে দিয়ে রাজার কাছে চিঠি পাঠিয়ে দিলে, যেন তিনি না ভাবেন। যে বিরাট সাম্রাজ্য একদিন নিজের বাহুবলে গড়ে তুলবে, সেই বিপুল ভূখণ্ড কেমন, তা সে নিজের চোখে দেখতে চায়; সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়। আগামী বৎসর সূর্য উত্তরায়ণে যাবার পূর্বেই সে ফিরে আসবে যেমন করে হোক।...

দশ-বারোটি ছেলে। বয়স আর কত হবে?—এই পনেরো-ষোল আর কি!

কত গ্রাম, নগর, মাঠ, জলা পার হয়ে এগিয়ে যায় ঘোড়া ছুটিয়ে। কোথাও অতিথি হয় গৃহস্থ-বাড়ীতে, সেখানে করে পরিচয় গোপন। কোথাও বা রাজধানীতে রাজার কাছে গিয়ে অতিথি হয়। পথে ছোট-খাটো যুদ্ধ-বিগ্রহের সুযোগ পেলে ছেড়ে দেয় না। কোথাও দস্যু-তস্কর উপদ্রব করছে শুন্‌লে তাদের মেরে গ্রামবাসীদের নিশ্চিন্ত করে। কোথাও বন্যবরাহ শিকার করে নিজেদের শক্তির পরীক্ষা করে।

এমনি করে যেতে যেতে যখন সুন্দর তক্ষশীলা পর্যন্ত চলে গেছে, তখন হঠাৎ রাজপুত্রের খেয়াল হলো,—তাইতো, বর্ষা যে যায়,—সামনে শুধু শরৎ আর হেমন্ত।—শীত পুরোটা পাওয়া যাবে না;—তার আগেই উত্তরায়ণ এসে পড়বে;—এখন উপায়?—সে যে বাবাকে কথা দিয়ে এসেছে উত্তরায়ণের আগেই ফিরে যাবে।

ছোট্ ছোট্!—দৌড়ো দৌড়ো! ঘোড়া আর বিশ্রামের অবকাশ পায় না। আরোহীদেরও আহার-নিদ্রা নেই। সকাল

থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত—এমন কি, পথ ভাল পেলে রাত্রেও সবাই ছুটে চলেছে অবিশ্রান্ত গতিতে।

কিন্তু সোজা যে রাজপথ, সে পথ দিয়ে ফিরলে কিছুতেই বাড়ী ফেরা যায় না ঐ সময়ের মধ্যে—রাজকুমারের বন্ধুরা হিসাব করে দেখে। একমাত্র বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গিয়ে পাখীরা যে ভাবে উড়ে যায় সরল রেখা ধরে, সেই ভাবে যেতে পারলে হয়ত বাড়ী পৌঁছানো যেতে পারে ঠিক সময়ে। রাজকুমার হুকুম দিলে—'তাই চলো! পথে বন্যজন্তুর দেখা পাই, বধ করবো; দস্যুদল আসে, আমাদের দেখে পালাবে।—ভয় কি ?'

তাই হলো। পথ ছেড়ে সবাই বনে-জঙ্গলে ঢুকলো। সূর্য আর নক্ষত্র দেখে দিক্ ঠিক করে নেয়; গাছের ফল আর শিকার-করা মাংস ঝল্‌সে খেয়ে দিন কাটায়।

একদিন এমনই এক শিকারের পিছনে ছুটতে ছুটতে রাজপুত্র এগিয়ে গেছে অনেকটা;

দলছাড়া হয়ে পড়েছে সে। দুপুর টা-টা করছে; তেষ্টায় বুক অবধি শুকিয়ে উঠেছে। জল চাই একটু—আর এখনই।

রাজকুমার কান পেতে শুনছে, দক্ষিণে বহু দূর থেকে সারসের ডাক আসছে কানে। নিশ্চয়ই জলাশয় আছে কাছেপিঠে কোথাও। সেই শব্দ লক্ষ্য করে ঘোড়া ছুটলো নক্ষত্রবেগে।

হ্যাঁ, জলই ত! পুকুর নয়, নদী। শুধু জল নয়, লোকালয়ও। ঐ যে দেখা যায় দূরে, পাহাড়ের কোলে। বন বুঝি শেষ হলো,—আর ভয় নেই।

তৃষ্ণার্ত রাজকুমার ঘোড়া বেঁধে রেখে দ্রুতপদে নেমে গেল

স্রোতের ধারে। খরস্রোতা পাহাড়ী নদী শেষ বর্ষার পরিপূর্ণ স্রোতে তীরবেগে বয়ে চলেছে। কিন্তু সে সব দিকে ওর লক্ষ্য ছিল না। জল চাই ওর, সেইটেই বড় কথা। ধারে বড় নোংরা ; জল বড় ঘোলা। তার চেয়ে ঐ যে বড় পাথরগুলো পড়ে আছে, ঐগুলোতে পা দিয়ে দিয়ে যদি এগিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে মাঝখানে ভাল জল পাওয়া যাবে।

যে কথা,—সেই কাজ। পাথরে পা দিয়ে দিয়েই এগিয়ে চললো রাজকুমার। কিন্তু বর্ষার জলে জলে পাথরগুলো হয়েছে পিছল। হঠাৎ পা-পিছলে রাজকুমার একেবারে গিয়ে পড়লো জলের মধ্যে। প্রবল স্রোত।—পা রাখতে পারে সে ক্ষমতা নেই। সাঁতার জানা আছে ; কিন্তু যা স্রোত, তাতে সাঁতার জানা না-জানা তুইই সমান। ডুবতে ডুবতে, ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ী নদীর জলে হাবুডুবু খেতে খেতে রাজকুমার ভেসে চললো। একটু আগে যে জলের অভাবে প্রাণটা যেতে বসেছিল, এখন সেই জলের প্রাচুর্যেই বুঝি জীবনটা যায়!

কাছে কেউ নেই। লোকালয় দূরে। সঙ্গীরা কত দূরে কে জানে! কেউ জানতেও পারল না,—মন্দশোরের যুবরাজ, চোখে যার বিশ্ব-বিজয়ের স্বপ্ন, প্রাণে যার সাম্রাজ্যবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা, সেই লোকটি আজ সামান্য একটা পাহাড়ী নদীর জলে বেঘোরে প্রাণ হারাতে বসেছে!

চীৎকার করেও কোন লাভ নেই, কারণ কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না ; কে তার ডাক শুনবে? কিন্তু আর পারাও যায় না। হাত-পা ক্লান্ত হয়ে এসেছে ; বার বার পেটে জল গিয়ে

দেহ হয়ে উঠেছে ভারী। ডুবছে ডুবছে,—এইবার সত্যিই ডুবছে সে।

কিন্তু না!—রাজকুমারকে দিয়ে ভগবানের আরও প্রয়োজন আছে।

বড় একটি পাথরের আড়ালে তারই সমবয়সী একটি মেয়ে জল নিচ্ছিল। রাজকুমার তাকে লক্ষ্য না করলেও, সে রাজকুমারকে দেখতে পেয়েছিল ঠিকই। হরিণীর মত লঘু অথচ দ্রুতপদে পাথরগুলোয় পা দিয়ে, জল ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ছুটে এল সে রাজকুমারের কাছে। তারপর ঘুরতে ঘুরতে জলের স্রোত রাজকুমারকে নিয়ে যেমন ওর পাথরখানার কাছে এসেছে, অমনি প্রাণপণ শক্তিতে সে রাজকুমারের চুলের মুঠিটা শক্ত করে টেনে ধরলে।

দেখতে ছোট ছিপ্‌ছিপে মেয়েটি, কিন্তু গায়ে জোর কম নয়। অতবড় দেহ রাজপুত্রের, কুস্তিকরা ভারী দেহ; পোশাকসুদ্ধ জলে ভিজে ভারী হয়েছে আরো। তবু সে রাজকুমারকে টেনে পাথরের ওপর তুললো। পাথরের ওপর এসে রাজকুমার এলিয়ে পড়লো। তার আর জ্ঞান রইলো না; চোখের পাতা যেন ভারী হয়ে বুজে এলো!

জ্ঞান যখন ফিরে এলো তখন দেখলো, মেয়েটি তার পরিচর্যা করছে। নিজের আঁচলে তার সর্বাঙ্গ মুছিয়ে দিয়েছে; ভিজে জামা নিয়েছে খুলে; হাত-পা ঘষে শরীর গরম করবার চেষ্টা করছে।

রাজকুমার ক্ষীণভাবে একটু হাসলে।—লজ্জার হাসি।

'তোমার নাম কি ?'

'মালবিকা।'

'কোথায় থাকো ?'

দূর গ্রামের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে মেয়েটি বললে—'ঐ যে ছোট্ট কুটির দেখা যাচ্ছে, ঐখানে আমার বাবা রাঘবাচার্য তপস্যা করেন। আমি তাঁর আশ্রমে থাকি।'

রাজপুত্র একটু ইতস্ততঃ করে বললো—'তুমি আমার প্রাণ দিয়েছ ; তোমাকে পুরস্কার দিতে পারি এমন কিছুই নেই। রাজ্য একটা তোমাকে এখুনি দিতে পারতুম, কিন্তু তাতে তোমার ঋণ কিছুই শোধ হয় না।…তুমি আমাকে বিয়ে করবে ?'

মালবিকা একটুও লজ্জিত হলো না, বরং সরল ভাবেই প্রশ্ন করলে—'ব্রাহ্মণ-কন্যাকে বিয়ে করতে চাইছ তুমি, তোমার পরিচয় কি ?'

রাজপুত্র মাথা হেঁট করে উত্তর দেয়—'আমার নাম যশোধর্মা। মন্দশোরের যুবরাজ আমি, এর বেশি যে পরিচয়, সে আমার নিজের শৌর্যে। পৃথিবী জয় করবার আকাঙ্ক্ষা আছে আমার বুকে।'

মালবিকা একটু হেসে বলে—'আমার বাবা ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাউকে কন্যাদান করবেন না। তা ছাড়া যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়দের ত নয়ই। তাঁর মতে, জোর করে অন্য রাজ্য যারা দখল করে, অকারণে যারা সহস্র লোকের মৃত্যুর কারণ হয়, তারা মানুষের কৃপার পাত্র। ব্রাহ্মণের কাজ এদের পথ দেখানো ; এদের আত্মার উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করা।—সে হয় না যুবরাজ।—আমি

তোমার প্রাণরক্ষা করতে পেরেছি, এ আমার পরম সৌভাগ্য। তুমি প্রসন্ন মনে ফিরে যাও, কোন ক্ষোভ রেখ না। তুমি আজ থেকে আমার ভাই হলে এইটে মনে করোনা কেন! বোনের কাছ থেকে কোন উপকার পেলে ভায়ের পক্ষে তা ঋণ মনে করার কোন কারণ নেই ত!'

যশোধর্মার দুই চোখ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ভরে গেল।—সে মাথা নেড়ে বললে—'তাই হবে বোন!—তবে তোমাকেও একটা কথা দিতে হবে। যদি কখনও কোন প্রয়োজন হয়, তাহলে ভাইকে নিশ্চয়ই স্মরণ করবে। তোমার কোন কাজে যদি লাগতে পারি, তবেই যে জীবন তুমি আজ দান করলে, তা সার্থক হবে!—স্মরণ করবে ত?'

মাথা হেলিয়ে মালবিকা বললে—'করব!'

হাত থেকে একটা আংটি খুলে যশোধর্মা মালবিকার হাতে দিয়ে বললে—'যেখানে থাকি না কেন, এই আংটি দেখালেই বুঝবো, তুমি আমায় স্মরণ করেছ। সব কাজ ফেলে তোমার ভাই তখনই তোমার কাছে পোঁছোবে।'

মালবিকা হেসে আংটিটা হাত পেতে নিয়ে একটু থেমে বললে—'হয়ত কোন দিনই আর এ আংটি ফিরে যাবে না।—তবু ভাইয়ের চিহ্ন থাক্।'

হূণ-দলপতি তোরমানের অত্যাচারে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত জ্বলে গিয়েছিল;—তার ছেলে মিহিরকুলের অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠলো। যে দিকে যায় সে, শুধু শ্মশানের ভস্মস্তূপ
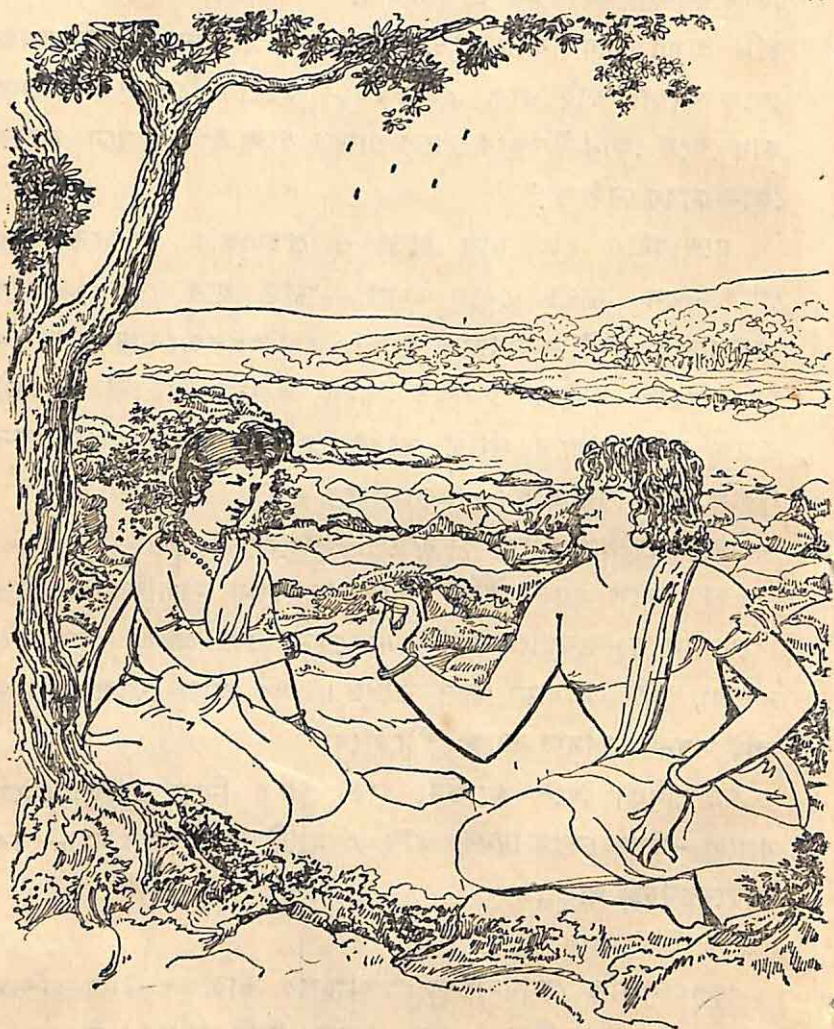
সৃষ্টি করে। কাল যেটা ছিল সমৃদ্ধ নগর, আজ তার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। চারিদিকে হাহাকার আর ক্রন্দন-রোল। এই বর্বরগুলো শুধু লুঠতরাজ আর হত্যা—এই জানে। যত রকম পৈশাচিক কাজ, তাতেই তাদের আনন্দ।

জনপদের লোকেরা ত নিপীড়িত হতে লাগলোই,—সাধু, তপস্বী, ব্রাহ্মণরাও বাদ গেলেন না! পাহাড়ের ওপর, বনের মধ্যে যাঁরা শুধু ঈশ্বর-আরাধনা ও মানবের কল্যাণ-চিন্তায় দিন কাটান, তাঁদের উৎপীড়িত করে যেন ওদের বেশি সুখ, বেশি আনন্দ! ওদের বিশ্বাস, এই মানুষগুলো আসলে অলস ও ভণ্ড। পাছে খেটে খেতে হয়, এই ভয়ে তপস্যার নাম করে ঘরে বসে থাকে।

এমনি এক তপস্বী দলের সঙ্গেই মথুরার কাছাকাছি গোবর্ধন পাহাড়ের কোলে এক আশ্রম থেকে মালবিকা আর তার স্বামী-পুত্রকে ধরে নিয়ে গেল হূণরা। বড় বড় ক্ষত্রিয়-রাজারা যাদের বাধা দিতে পারেন নি,—নিরীহ নিরস্ত্র ব্রাহ্মণরা কি করে বাধা দেবেন তাদের? তাঁরা সে চেষ্টাই করলেন না; শুধু চোখের জল আর দীর্ঘনিশ্বাস নীরবে নিবেদন করে দিলেন ভগবানের উদ্দেশে।

ওদের ধরে নিয়ে গিয়ে হূণ-দলপতি প্রস্তাব করলেন—মালবিকা যদি তাঁর মেয়ের সঙ্গে হূণের বিয়ে দেন এবং ছেলেকে হূণ সেনাদলে চাকরী করতে দেন, আর মালবিকার স্বামী যদি হূণদের সঙ্গে একত্র আহার করেন তবে ওঁদের দুই স্বামী-স্ত্রীকে তাঁরা ছেড়ে দিতে পারেন।

বলা বাহুল্য এ প্রস্তাবে তাঁরা কেউই রাজী হলেন না।

অন্ধকার কারাগারে তাঁরা সকলে অনাহারে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। হূণের অন্ন গ্রহণ করবেন না মালবিকার স্বামী ; কাজেই তিনি অনাহারে রইলেন। ফলে মালবিকারও উপবাসে দিন কাটতে লাগল। মৃত্যু ছাড়া আর কোন পথ রইলো না এঁদের।

কিন্তু নিজে অনাহারে মরা এক কথা, আর চোখের সামনে স্বামী-পুত্রকে মরতে দেখা অন্য কথা। মালবিকা আর পারলেন না! এমনি ভাবতে ভাবতে আর ভগবানকে ডাকতে ডাকতে হঠাৎ একদিন মালবিকার চোখে পড়ে যায় যশোধর্মার দেওয়া সেই আংটিটা। হূণরা সব কেড়ে নিয়েছিল, কেবল ওটাকে তিনি অতিকষ্টে রক্ষা করেছিলেন।—এই ত, একজন ত এখনও আছে, যে অন্তত তাঁদের রক্ষা করবার চেষ্টাও করতে পারে! মালবিকা শুনেছেন, মন্দশোরের রাজা যশোধর্মা আজ বিরাট এক সাম্রাজ্যের অধিপতি। মালব পর্যন্ত তাঁর পদানত। তিনি চেষ্টা করলে হয়ত……

আবার সংশয় জাগে মনে, আজও কি মালবিকার কথা মনে আছে তাঁর ? কিন্তু এতদিন পরে এই যে আংটিটার কথা মনে পড়া, এও কি ভগবানেরই ইঙ্গিত নয় ? না—নিশ্চয়ই সব আশা এখনও যায় নি ;—উপায় একটা এখনও আছে।

প্রহরীদের মধ্যে একটি তরুণ হূণ ইতিমধ্যে মালবিকার ভক্ত হয়ে পড়েছিল।

কিছুদিন আগে এই তরুণ হূণটি এক দুরারোগ্য রোগে পড়েছিল। সকলেই তার জীবনের আশা ত্যাগ করেছিল।—

মৃত্যু একবারে অবধারিত। মালবিকার বাপ ছিলেন সাধুসন্ন্যাসী মানুষ। অনেক রকম গাছ-গাছড়া আর টোট্‌কা ওষুধ তাঁর জানা ছিল। সেই সব ওষুধ তিনি মরবার আগে দিয়ে গিয়েছিলেন মালবিকাকে। মালবিকা তাই থেকে একটা ওষুধ দেয় তাকে খেতে। তাইতেই তরুণ হূণটি সে যাত্রা বেঁচে যায়। একেবারে যমের হাত থেকে ফিরিয়ে আনেন তাকে মালবিকা। তারপর থেকে সে হয়ে ওঠে মালবিকার পরম ভক্ত। সে গোপনে ফলমূল দিয়ে যেতো ওঁদের ঘরে। তাই ভাগ করে খেয়ে এঁদের জীবনধারণ হতো। এই ছেলেটিকেই ডেকে একদিন মালবিকা অনুরোধ জানালেন, কোনমতে এই আংটিটি যশোধর্মাকে পৌঁছে দিয়ে জানাতে হবে যে তাঁর ভগ্নী মালবিকা হূণদের হাতে বন্দী।

হূণ-যুবক মাথা নামিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করলো। তারপর বললো—'সে আমি পারবো না দেবী! আমাকে মাপ করবেন! যশোধর্মাকে এই সংবাদ দিলেই তিনি হূণদের আক্রমণ করবেন। যদিও না মিহিরকুলকে তিনি পরাস্ত করতে পারেন, তবু কয়েক সহস্র হূণ ত মরবে সে যুদ্ধে। এ শুধু বিশ্বাসঘাতকতা নয়, স্বজাতিদ্রোহিতাও ;—এ আমি পারবো না!'

মালবিকা বুঝিয়ে বলেন—'কিন্তু তোমাদের রাজা ত দেশের পর দেশ, রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে এগিয়ে চলেছেন। আজ হোক্ কাল হোক্, যশোধর্মার সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধবেই। তাছাড়া যুদ্ধের ভয় বা লোকক্ষয়ের ভয় তিনি ত করেন বলে মনে হয় না। —ঐতেই ত তাঁর আনন্দ।'

হূণ-যুবক বলে—'তবু যা নিজের নিয়মে হয় হবে;—আমি নিমিত্তের ভাগী হতে পারবো না।'

মালবিকা ওর পায়ের কাছে বসে পড়ে সজলনেত্রে বলে—'আমি ভিক্ষা চাইছি।'

ছেলেটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে—'এ প্রাণ আমাকে একদিন আপনিই দিয়েছিলেন, সুতরাং এ আমি আপনার কাজে উৎসর্গ করতে বাধ্য।—দিন, আমি যেমন করেই হোক্ পৌঁছে দেব।'

রাজা যশোধর্মা চিন্তিত মুখে সিংহাসনে বসে। ভারতের বিভিন্ন দেশ থেকে রাজারা প্রার্থনা জানিয়ে দূত পাঠিয়েছেন,—হূণদের অত্যাচারে দেশ যায়;—এ বিপদে যদি যশোধর্মা না রক্ষক হন, তাহলে কারুর আর রক্ষা নেই। ভগবান যখন তাঁকে শক্তিশালী করেছেন, তখন তাঁর উচিত সে শক্তির সদ্ব্যবহার করা।

যাঁরা এই আবেদন জানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একদা-প্রতাপশালী গুপ্তবংশেরও এক রাজা আছেন। ভগবানের কি বিচিত্র লীলা! যে গুপ্ত-সম্রাটরা একদিন বার বার বিদেশী শত্রুদের ভারত থেকে বিতাড়িত করেছেন, তাঁদেরই বংশধর একজন আজ সাহায্য ভিক্ষা করতে এসেছেন যশোধর্মার কাছে!… এ হয়ত ঈশ্বরের ইঙ্গিত। আজ যশোধর্মার হাত দিয়েই তিনি এই পবিত্র ভূমির উদ্ধার-সাধন করবেন,—তাই এই সব ব্যবস্থা। যশোধর্মার যশ ও গৌরব বৃদ্ধির জন্যই হয়ত অন্য রাজাদের তিনি হীনবল করেছেন।

কিন্তু তবু—

—তবু একটা কথা আছে বৈ কি!

অনেকক্ষণ চিন্তা করে যশোধর্মা ধীরে ধীরে মুখ তুললেন।—বললেন, 'আপনাদের অনুরোধ আমার পক্ষে গৌরবের কথা, সন্দেহ নেই। কিন্তু হূণরা যে আজ দুর্ধর্ষ শক্তির অধিকারী। তাদের বিপক্ষে একা দাঁড়াবার মত শক্তি আমার আছে কি না সন্দেহ। অথচ আপনাদের কারুর সাহায্য পাবো, এমন আশাই বা করতে পারছি কৈ!'

গুপ্তদের দূত বললেন—'সে কি কথা মহারাজ! এখানে উপস্থিত যাঁরা আছেন, তাঁরা যে রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি, সেই সব ভারত-বিখ্যাত ক্ষত্রিয়-কেশরীরা নিশ্চয়ই আপনাকে সাহায্য করবেন। আজ সকলের এক পতাকাতলে সমবেত হবারই দিন এসেছে যে!'

কঠোর স্বরে যশোধর্মা বললেন—"দূত, সে দিন কি আজই মাত্র এসেছে? সেদিন বহু পূর্বেই এসেছিল, যেদিন হূণরা এদেশের মাটিতে প্রথম পা দেয়,—সেই দিনই। আমাদের রাজারা যদি কয়েক জনও বিপদের সময় মিলিত হতে পারতেন, তা হলে কোন বিদেশীই এ মাটিতে পা দিতে সাহস পেত না। অপরের বিপদ যে কোন দিন আমাদের বিপদ হতে পারে, এ দূরদৃষ্টি এবং কল্পনা কারুর নেই বলেই এতদিন ভারতের সব নৃপতিরা চুপ করে বসে দেখেছেন, এই বিদেশী দস্যুগুলো একটির পর একটি দেশ দখল করছে ও শ্মশান করে দিচ্ছে। আপনাদের যাঁরা প্রেরক, তাঁদের ঘুম কি এতদিনে ভাঙলো? কেন, ভারত কি এতদিন নিঃক্ষত্রিয় হয়ে ছিল?'

উপস্থিত সব দূতই নীরবে নতমুখে এই তিরস্কার সহ্য করলেন। —তাছাড়া উপায়ই বা কি?—কথাগুলো সবই যে সত্য—একেবারে অকাট্য সত্য।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যশোধর্মা আবার বললেন—'আজ আপনারা বলছেন যে, আমাকে সাহায্য করবেন; কিন্তু কেমন করে জানবো যে, কার্যকালে আপনারা ঈর্ষাবশত পেছিয়ে যাবেন না? তাঁরা সাহায্য করবেন, অথচ যুদ্ধজয়ের গৌরব আমার হবে,—এই ঈর্ষাতে এর আগে বহু সর্বনাশ হয়ে গেছে।—আবারও যে হবে না তার ঠিক কি?...কিসের ভরসাতে আমি আমার লক্ষ লক্ষ প্রজাকে মৃত্যু আর দুর্ভিক্ষের মধ্যে ঠেলে দেবো? শত্রু ত রাজ্যসীমা থেকে বহু দূরে। হয়ত তারা কোন কালেই আমার দেশ আক্রমণ করবে না।—অনর্থক এ বিপদকে আমন্ত্রণ করে আনি কেন?"

এই পর্যন্ত বলে তিনি থেমেছেন, এমন সময় রাজধানীর সহর-কোটাল এসে নিবেদন করলেন—'মহারাজ, একটি হূণ-সৈনিককে গুপ্তচর সন্দেহে রাজ্যসীমার মধ্যে বন্দী করা হয়েছে; কিন্তু সে বলছে যে, মহারাজের ভগ্নীর কাছ থেকে সে কি সংবাদ নিয়ে এসেছে!'

'আমার ভগ্নী?'

'হাঁ মহারাজ!—এ অবিশ্বাস্য কথা আমরা প্রথমে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলুম, কিন্তু প্রমাণস্বরূপ সে আপনার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক বার করলো। সে বললো, একবার তাকে শুধু আপনার কাছে উপস্থিত করা হোক্, তাহলেই সে সব কথা আপনাকে বুঝিয়েদিতে পারবে।'

'বেশ, তাকে নিয়ে এসো এখানে!'

মহামাত্য তাড়াতাড়ি বললেন—'তাকে নিরস্ত্র করা হয়েছে ত ?'

'নিশ্চয়ই!'

হূণ যুবক বন্দী অবস্থায় এসে দাঁড়িয়ে মহারাজকে অভিবাদন জানালে। তারপর আংটিটা বার করে এক প্রহরীর হাতে দিয়ে ইঙ্গিত করলে তাঁকে দেখাতে।

আংটিটা হাতে নিয়ে যশোধর্মা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। এ আংটি তাঁরই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কবে, কোথায়, কি করে এ আংটি হারিয়েছিল, আজ আর মনে করতে পারছেন না। এর সঙ্গে কী যেন কাহিনী জড়িত আছে!—বিস্মৃতির আড়ালে ঝাপ্‌সা, অস্পষ্ট কী একটা স্মৃতির সঙ্গে এ যেন মিশে রয়েছে!—মনে পড়ছে, অথচ মনে পড়ছে না!

ওহো!—মনে পড়েছে—মনে পড়েছে!…

'যুবক, তুমি দেবী মালবিকার কাছ থেকে আস্‌ছ ?'

'হ্যাঁ মহারাজ!'

'প্রহরীগণ, ওকে মুক্ত করে দাও,—সত্যই এ আংটি আসছে আমার এক ভগ্নীর কাছ থেকে।'

প্রহরীরা ওকে ছেড়ে সম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল। হূণ যুবকটি সব কথা বলে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

অসহনীয় ক্রোধে যশোধর্মার মুখ হয়ে উঠল রক্তবর্ণ। তিনি প্রথমেই বললেন,—'মহামাত্য, আপনি যুদ্ধের আয়োজন করুন। আজ আমার এই সিংহাসনে বসা যে দেবীর জন্য সম্ভব হয়েছে,

যিনি নিজের প্রাণ দিয়ে আমাকে বাঁচিয়েছিলেন, তিনি হূণদের হাতে লাঞ্ছিতা হচ্ছেন,—তিনি বন্দিনী। বোঝা গেল, হূণদের মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, তাই এমন দুর্বুদ্ধি হয়েছে তাদের। দূতগণ, আপনারা আপনাদের প্রার্থনার উত্তর পেয়ে গেলেন। ফিরে গিয়ে আপনাদের নিজ নিজ প্রভুর কাছে জানাবেন যে, তাঁরা যদি আমাকে সাহায্য করেন ত ভালই ; তাঁদেরই গৌরব বৃদ্ধি হবে তাতে, ক্ষত্রিয়দের লজ্জা দূর হবে।—আর যদি সাহায্য নাও করেন ত ক্ষতি নেই, আমি একাই যুদ্ধে যাবো। জীবনের ঋণ না হয় জীবন দিয়েই শোধ হবে !'

তারপর হূণ-সৈনিকটির দিকে চেয়ে বললেন,—'যুবক, তুমি আমার মহা-ঋণশোধের উপায় করে দিয়েছ, আমাকে অনন্ত লজ্জা ও অগৌরবের হাত থেকেও বাঁচিয়েছ, তার জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। বলো, তুমি কি পুরস্কার চাও ?—মুক্তামালা, সহস্র সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, কিংবা ভূখণ্ড, যা চাইবে তাই দেব।'

হূণ-যুবকটি নতজানু হয়ে বললো, 'মহারাজ, আমি সৈনিক, অস্ত্রত্যাগ আমার কাছে মৃত্যুর চেয়ে কষ্টকর। এঁরা আমার তরবারি কেড়ে নিয়েছেন, সেইটি ফিরে পেলেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার পাওয়া হল মনে করব।'

'নিশ্চয়ই ! যুবক, তোমার অস্ত্র ত ওঁরা ফিরিয়ে দেবেনই, আমার এই তরবারিও তোমায় উপহার দিলাম। বড় খুশি হয়েছি তোমার কথাতে। বীরের উপযুক্ত কথাই বলেছ।'

রাজ-তরবারি মাথা পেতে নিয়ে হূণ-যুবক উঠে দাঁড়াল। তারপর কেউ কিছু বোঝবার বা বাধা দেবার আগেই বিদ্যুৎবেগে

সেই তরবারি দিলে সে নিজের বুকে বসিয়ে। বুকে বিঁধে তার অগ্রভাগ পিঠ ফুঁড়ে বেরোল।

'এ কি! এ কি যুবক! এ কি করলে!' সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। হূণ-সৈনিকটি ক্লান্তকণ্ঠে উত্তর দিলে,—'আমিও জীবন দিয়ে জীবনের ঋণ শোধ করলাম মহারাজ!...স্বদেশ ও স্বজাতির সর্বনাশ করার পরও প্রাণধারণ করা কি সম্ভব? এ কলঙ্ক আমার রক্তেই ধুয়ে যাক্।'

একটু পরেই তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

তারপর?

তারপর যা, তা তোমরা তোমাদের স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের বইতেই পড়েছ। যশোধর্মা মিহিরকুলকে বিতাড়িত করে হূণদের অত্যাচার থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করলেন। উত্তর-ভারতের সর্বশেষ প্রান্ত থেকে মধ্যভারত পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব বিস্তৃত হল। তাঁর যশোগৌরবে ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কিন্তু যাঁর জন্য এই অসম্ভব সম্ভব হল, সেই মালবিকাকে উদ্ধার করতে তিনি পারেন নি। সংবাদ আসা এবং যুদ্ধযাত্রা করা—এই দীর্ঘ সময় তাঁর পক্ষে স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়নি।

দেবতার রোষ

আঙ্কোর বা ওঙ্কার পুরীতে আজ উৎসবের শেষ নেই। এত বড় নগরী, সমস্ত পৃথিবীতে যার তুলনা মেলে না, ঐশ্বর্যে ও বিপুলত্বে যা বহু দিন থেকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শহর বলে গণ্য—তার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত আলো আর ফুলের মালায় সাজানো হয়েছে। সমস্ত নাগরিকের পরিধানে নতুন কাপড়, নাগরিকরা নতুন নতুন অলঙ্কারে সেজেছেন। রাজ্যের সমস্ত প্রত্যন্ত ভাগ থেকেই ফুল এসেছে, সোলার ফুলেরও অভাব নেই, তবু না কি আজ এক-একটি ফুলের মালা আট-দশ টাকায় বিক্রী হচ্ছে! বাজারে কোথাও কোন মিষ্টি খাবার নেই—সব রাজবাড়ী থেকে লোক এসে কিনে নিয়ে গেছে—প্রজা-সাধারণকে প্রজাধিনায়কের তরফ থেকে জলযোগ করানো হবে।

অবশ্য এ আনন্দের কারণ আছে বৈকি! সম্রাট বিষ্ণুবর্মণ্ আবার কাম্বোজের হৃত-গৌরব ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা, জয়বর্মণ্, ইন্দ্রবর্মণ্—এঁরা একে একে যে ভাবে কাম্বোজের সাম্রাজ্য-সীমা বিস্তৃত করে তার শক্তিকে সার্বভৌম করে রেখে গিয়েছিলেন, পরবর্তী সম্রাট্‌রা সে কীর্তির কিছুমাত্র মর্যাদা রাখতে পারেননি। সিংহবিক্রম শৈলেন্দ্র সম্রাট্‌রা এবং মাজাপাহিতের সিংহশ্রী নৃপতিরা উপর্যুপরি আক্রমণে আঙ্কোরের বিপুল শক্তির মূলদেশ পর্যন্ত টলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু, এত দিন পরে মনে হচ্ছে, কাম্বোজের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী আবার মুখ তুলে

চেয়েছেন! বিষ্ণুবর্মণ্ সিংহশ্রীদের একটি যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছেন, চার হাজারের ওপর মাজাপাহিত সৈন্যদের বন্দী করেছেন এবং ওদের বাণিজ্য-তরী এনে নিজেদের বন্দরে আটক রেখেছেন। এর বেশী আনন্দ-সংবাদ আর ওঙ্কার পুরীর নাগরিকদের কাছে কী হতে পারে? আজ তাই নগরের বালক-বৃদ্ধ-নারীনির্বিশেষে সমস্ত প্রজা আনন্দে মেতে উঠেছে।

সম্রাট্ বিষ্ণুবর্মণের মন্ত্রী নিজে এ উৎসবের পুরোধা। তিনিই কর্ম-সূচী তৈরী করে দিয়েছেন। সকালে নাগরিক ও নাগরিকারা স্নান করে, নৃত্য-গীত সহকারে শোভাযাত্রা করে যাবে ওঙ্কার বট মন্দিরে। সেখানে অনন্তনাগের পূজা শেষ করে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে এসে সম্রাটকে দর্শন করবে এবং প্রসাদ হিসাবে কিছু মিষ্টান্ন জল-যোগ করে যে যার বাড়ী ফিরে যাবে। তার পর সন্ধ্যায় নিজের নিজের বাড়ীতে আলো জ্বেলে যাবে নদীতীরে—সেখানে নৌকায় বাচ খেলা হবে এবং নৌকার ওপরই পোড়ানো হবে আতসবাজী। এ বস্তুটি একেবারে নতুন, চীন থেকে নাকি কে এক ওস্তাদ ঐন্দ্রজালিক এসেছে—সে স্বয়ং অগ্নিদেবকে করেছে করতলগত। এই বাজী দেখবার জন্যই আরো সমস্ত নাগরিকরা অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করছে, সুদূর গ্রাম-প্রান্ত থেকেও বিস্তর লোক এসে পৌঁচেছে।

এ-হেন উৎসবের দিনে সহসা এক বিঘ্ন উপস্থিত হল।

সম্রাট্ স্নান-পূজা শেষ করে প্রজাদের দর্শন দিতে যাবার আগে মন্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, 'সঞ্জয়, গুরুদেবকে দেখছি না কেন? তিনি কোথায়? তাঁকে প্রণাম করব যে!'

সঞ্জয় মাথা হেঁট করে জবাব দিলে, 'সে প্রশ্ন আমাকে করবেন না মহারাজ, আজকের দিনে ও-কথা থাক্।'

'সে কি! আজকের দিনেই যে তাঁকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।'

'তিনি আসবেন না।'

'আসবেন না? কেন? আমাদের এ জাতীয় বিজয়ে কি তিনি খুশী হন্‌নি?'

'না। তিনি বলেন, যুদ্ধ যুদ্ধই। একটা বিজয়, আর একটা পরাজয়েরই সূচনা করে, যদি না সমস্তটা মনুষ্যত্বের দিক্ দিয়ে বিবেচনা করা হয়। তিনি বলেছেন যে, পূর্ব পূর্ব সম্রাট্‌রা অকারণে বহু দেশ আক্রমণ করেছেন, বহু লোকের প্রাণক্ষয়ের কারণ হয়েছেন শুধু নিজেদের গৌরব ও ঐশ্বর্যবৃদ্ধির জন্য। সাম্রাজ্য বাড়িয়েছেন কিন্তু বিজিত দেশগুলিকে নিজের দেশের অংশ বলে গ্রহণ করতে পারেননি। তাদের শোষণ করেছেন—শাসন করেননি। তারই ফলে তারা যদি আজ শক্তি সঞ্চয় করে আপনাদের বার বার আক্রমণ এবং ক্ষতি করে ত সে নির্যাতন আপনাদেরই প্রাপ্য। এম্‌নি ভাবে জাতিরা পরস্পরকে যদি শুধুই বিজেতা ও বিজিতের মনোভাব নিয়ে দেখে ত মানুষের কল্যাণ কোন দিনই হবে না। তিনি এই বিজয়লাভের ফল না কি প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছেন ভবিষ্যতে কাম্বোজের শোচনীয় পরাজয় এবং লোকক্ষয়। সেই জন্যই তিনি ব্যথিত এবং আনন্দ-উৎসবে যোগদানে অক্ষম।'

সম্রাটের মুখ রাগে ও অপমানে লাল হয়ে উঠল। তবু তিনি আত্মসংবরণ করে বললেন, 'তিনি কি করতে বলেন?'

'তিনি বলেন যে, যে সব মাজাপাহিতের নাগরিকদের বন্দী করে এনেছেন তাদের সসম্মানে ছেড়ে দিতে এবং নিজেদের ব্যয়ে তাদের দেশে পৌঁছে দিয়ে আস্‌তে। তিনি আরও বলেন যে, ওদের বণিকদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে বাণিজ্য-তরীগুলিও ফেরৎ পাঠান উচিত এবং সিংহশ্রী সম্রাটদের কাছে আমাদের আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।'

'কিন্তু'—ব্যঙ্গের সুরে সম্রাট বললেন, 'কিন্তু উদার-হৃদয় গুরুদেব কি ভুলে গেছেন যে, আক্রমণ ওরাই আগে করেছিল, আমরা করিনি! ক্ষমা প্রার্থনা, ক্ষতিপূরণ যা কিছু ওদেরই করা উচিত, আমাদের নয়।'

'সে কথাও তাঁকে বলেছিলাম, সম্রাট! তার উত্তরে তিনি বললেন যে, অন্যায়ের প্রতিকার অন্যায়ে হয় না। তারা আমাদের প্রজাদের প্রতি অসৎ ব্যবহার করেছিল বলেই তোমরা যদি তার প্রতিশোধ নাও, তাহলে বৃহত্তর প্রতিহিংসার জন্যই প্রস্তুত থাক্‌তে হবে। বুদ্ধিমানের রাজনীতি হল বিজিতের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করা, হিংসা দিয়ে হিংসাকে জাগ্রত করা নয়। একটা অন্যায় আর একটাকেই ডেকে আনে।'

রাজাধিরাজ আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বল্‌লেন, 'সঞ্জয়, তুমি সেই বৃদ্ধকে বুঝিয়ে দাও গে যে, রাজনীতিটা সন্ন্যাসীর জন্য নয়। তা ছাড়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ করা, সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা; হার-জিত যুদ্ধের অঙ্গ, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই। বর্তমানে জয়লাভ করেছি এইটুকুই যথেষ্ট। তিনি গুরু হতে পারেন কিন্তু তিনি ভুলে

যাচ্ছেন যে তিনি আমার প্রজা। তাঁকে আমার আদেশ জানিয়ে বলো গে যে, দ্বিপ্রহরের মধ্যে তাঁকে রাজপুরীতে আসতে হবে।'

সঞ্জয় তখনই যাত্রা করলেন। দূত পাঠাতে ভরসা হল না। গুরুদেব তখন নদীতীরে তাঁর আশ্রমে বসে গভীর শান্তির মধ্যে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করছিলেন। সঞ্জয়কে দেখে আশীর্বাদ করে বললেন, 'কি সংবাদ বৎস?'

সঞ্জয় রাজার আদেশ জানালেন। গুরুদেব সব শুনেও এতটুকু রাগ করলেন না, তাঁর মুখের প্রশান্তি এতটুকু নষ্ট হল না। বরং হেসেই বললেন, 'তাঁকে আমার আশীর্বাদ দিয়ে বলো যে, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে কাজ করাই রাজধর্ম। মানুষ মাত্রই স্বাধীন, এক জাতি অপর জাতিকে শাসন করে এটা ঈশ্বরের নিয়ম নয়। তারা তোমাদের দেশ আক্রমণ করেছিল বটে কিন্তু তার আগে তোমরা করেছ বহু বার। তারা তোমাদের সৈন্য বন্দী করে অত্যাচার করেছিল বলেই আজ তোমরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছ, কিন্তু তাই বলে আবার তোমরা যদি সেই অত্যাচারই করো ত তারাও এম্‌নি করে সেই কথা মনে করে রাখবে। এমনি করেই পৃথিবীতে হিংসা ও যুদ্ধ বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এতে মানুষের কোন কল্যাণ নেই। তুমি বিষ্ণুবর্মণকে বলো গে যে, যতক্ষণ না বন্দী সৈন্যগুলিকে অতিথি হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে, ততক্ষণ এ উৎসবে আমি যোগদান করতে পারব না।'

'কিন্তু তাঁর আদেশ অত্যন্ত কঠিন গুরুদেব!'

'আমার বিবেকবুদ্ধি আরও কঠিন বৎস। বিষ্ণুবর্মণ আমার ঐহিক সম্পত্তিরই অধীশ্বর, মনের নন্। বিচার ও বিবেক-বুদ্ধি

আমি ঈশ্বরকে অর্পণ করেছি।...আরও ব'লো যে তিনি যেন বলপ্রয়োগ না করেন, তাতে তাঁর দুর্বলতাই প্রকাশ পাবে।'

সঞ্জয় ফিরে এসে সংবাদ দিতে বিষ্ণুবর্মণ নিষ্ঠুর মোঙ্গল সৈন্যদের ডেকে পাঠালেন। এদের সাহায্যেই তিনি এবারের যুদ্ধ জিতেছেন, এই বিদেশীদের সৈন্যদলে ভর্তি করার বুদ্ধি তাঁর, সেজন্য তিনি রীতিমত গর্ব অনুভব করে থাকেন। এই মোঙ্গল সৈন্যদের নিয়ে বিষ্ণুবর্মণ নিজে চললেন সন্ন্যাসী গুরুদেবকে শাসন করতে।

তিনি তখনও তেমনি শান্ত মনে বসে পুঁথি পড়ে যাচ্ছেন। সম্রাট তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এই শেষ বার আদেশ জানাচ্ছি আপনাকে, এখনই গিয়ে আপনাকে উৎসবে যোগ দিতে হবে!'

গুরুদেব স্মিত হাস্য করে বললেন, 'বৎস, তুমি তোমার ব্যবহারে এই জাতি ও দেশকে শাসন করবার যোগ্যতা হারিয়েছ। সুতরাং গুরুর পদবী ছেড়ে দিলেও প্রজা হিসাবে আমাকে আদেশ করবার অধিকার আর তোমার নেই।'

ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে বিষ্ণুবর্মণ বললেন, 'এ দেশের রাজা আমি, এখানে আমার ইচ্ছাই ন্যায়। কোন অন্যায় আমি করি না, আমার অধিকার মানুষের শুধু দেহ নয়—ইচ্ছার ওপর, মনের ওপরেও। আপনাকে যেতেই হবে।'

গুরুদেব বললেন, 'হায় অন্ধ! দেশের রাজা বলে তোমার অহঙ্কার! এই নদীটাও ত দেশের অন্তর্ভুক্ত, একে কি তোমার আদেশ পালন করাতে পারো? তুমি কত অসহায়, ঝড়-ঝঞ্ঝা,
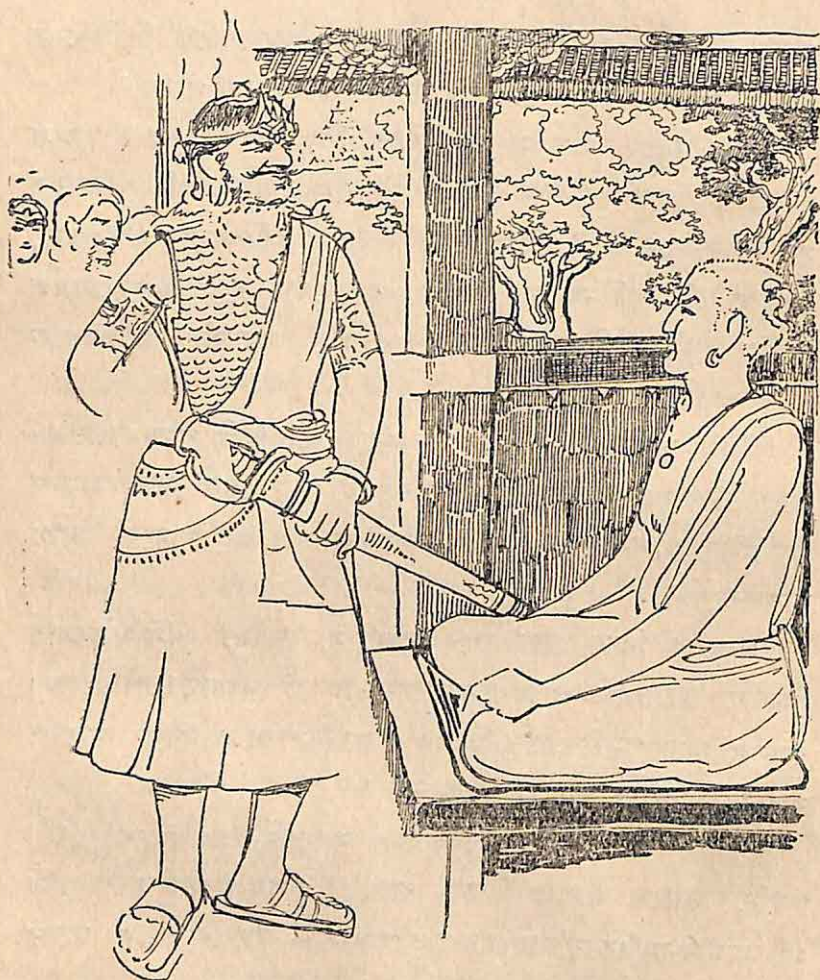
ভূমিকম্প, প্রাকৃতিক দুর্যোগ—কোনটার ওপরই ত তোমার হাত নেই। এই সকলের যিনি রাজা, আমি একমাত্র সেই ঈশ্বরকেই আমার অধীশ্বর বলে মনে করি। তুমি যাও, তোমার আদেশ আমার ওপর প্রযোজ্য নয়।'

রাজা ইঙ্গিত করলেন মোঙ্গল সৈন্যদের। নিমেষে তারা সেই সন্ন্যাসীকে বন্দী করল—একটু পরেই সেই নির্লোভ শান্ত অহিংসা-পরায়ণ পরম তপস্বীর শোণিতধারা মেকং নদীর সলিলধারায় গিয়ে মিশল! তাঁর দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহ নিয়ে তারা উল্লাস করতে করতে রাজধানীতে ফিরে গেল। রাজাদেশ অবহেলার ফল কি, তা প্রজারা প্রত্যক্ষ দেখুক! ঈশ্বর অদৃশ্য, তাঁকে মানতে গিয়ে, যিনি সশরীরে বিদ্যমান সেই রাজাকে যারা অবহেলা করে, সে নির্বোধদের এমনিই হয়। সবাই দেখুক, রাজা বড় কি ঈশ্বর বড়!

কিন্তু সন্ধ্যার কিছু পূর্বে, রাজা যখন মহার্ঘ পোষাকে সজ্জিত হয়ে নৈশ উৎসবে যাত্রা করছেন, হঠাৎ তাঁর কানে খুব দূরাগত একটা গর্জন এসে পৌঁছল—মেঘের ডাকের মত কিংবা জলের গর্জনের মত। তিনি কান পেতে শুনছেন এমন সময় বিবর্ণ মুখে সঞ্জয় এসে সংবাদ দিলে, 'রাজাধিরাজ, সর্বনাশ হয়েছে, নদীর উৎসব বন্ধ রাখতে হবে, নদীতে বন্যা আসছে।'

'বন্যা আসছে? এমন অসময়ে? সে কি?'

'হ্যাঁ প্রভু। আর এমন প্রলয়ঙ্কর বন্যা আমরা কখনও দেখিনি। মুহূর্তে মুহূর্তে জল বাড়ছে। ঐ শুনুন প্রজাদের আর্তনাদ—উৎসবের আনন্দ-কোলাহল ক্রন্দন-রোলে পরিণত হয়েছে।'

সম্রাট ছুটে অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন। সঞ্জয়ের কথা সত্য, এমন বন্যা কেউ কখনও দেখেনি। যেন মনে হচ্ছে মেকং নদী

হঠাৎ পথ বদলে একেবারে রাজধানীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে! চারি দিক জলপ্লাবিত, তখনও গর্জন করতে করতে পাহাড়ের মত ঢেউ ভেঙ্গে জল ছুটে আসছে। আসছে ত আসছেই—এত বড় বিশাল পুরীর আর কিছু বোধ হয় জেগে থাকবে না!

বিষ্ণুবর্মণ্ পাগলের মত ছুটলেন আত্মরক্ষার জন্য। উৎসবের জন্য যে নৌকা প্রস্তুত ছিল, তারই একটাতে গিয়ে বসলেন; কিন্তু তখন সবাই নিজের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত—রাজা বলে কেউ খাতির করল না। তিনি যে নৌকাতে ছিলেন তাতে আরও বহু লোক এসে আশ্রয় নিলে। ধমক, ভয় দেখানো কিছুতেই কিছু হল না। শেষে এত ভারী হয়ে উঠল নৌকা যে, বন্যার জলের একটা ঢেউ এসে লাগতেই নৌকা উল্‌টে গেল। বিষ্ণুবর্মণ সাঁতার জানতেন কিন্তু সে স্রোতে সাঁতার কাটাও অসম্ভব। শেষে কী একটা ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে দেখে প্রাণপণে গিয়ে সেইটেই আঁকড়ে ধরলেন।

যেটা আঁকড়ে ধরলেন—একটু পরেই বোঝা গেল—সেটা গুরুদেবেরই দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহ!

সেই যে বন্যার জল এল সে জল আর গেল না। দিন গেল, মাস গেল, বৎসর গেল, শতাব্দী গেল—বন্যা আর সরল না। ধীরে ধীরে শহরের চতুর্দিক জলা আর জঙ্গলে ভরে গেল, নিবিড় অরণ্যে ঢেকে গেল সেই বিপুল শহর আর সেই বিরাট মন্দির। এত বড় ঐশ্বর্য এবং শক্তির কোন চিহ্ন রইল না।

এর বহু শতাব্দী পরে এক ওলন্দাজ ভদ্রলোক জলা-জঙ্গলের

মধ্যে শিকার করতে গিয়ে হঠাৎ ওঙ্কার বট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেয়ে চম্‌কে উঠেছিলেন। এত বড় দীর্ঘায়তন মন্দির জলার মধ্যে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে—চামচিকা বাদুড় আর সাপের বাসা হয়ে! আশ্চর্য!

ক্রমে মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে শহরটাও আবিষ্কৃত হল। সবাই অবাক্ হয়ে গেল এই ভেবে যে, এত বড় শহর কবে এমন ভাবে জঙ্গলে ঢেকে গেল, আবার এমন করে এ শহর ছেড়ে দেশের লোক পালালই বা কেন! শহর পুরানো হলে এক সময়ে মাটির নীচে ঢাকা পড়ে কিন্তু এর বাড়ী-ঘর যে এখনও ঠিক রয়েছে, এমন কি কতক বাড়ী তৈরী হতে হতে সেই অর্ধ-সমাপ্ত অবস্থাতেই থেকে গেছে যে!

কেন এমন হল—কী করে এমন হল?—এই প্রশ্নই সবাই আজও করছে। কিন্তু জবাব কেউ পায় না!

পাশুপত অস্ত্র

তোমাদের মধ্যে যারা খবরের কাগজ পড়ো তারা নিশ্চয়ই দেখেছো যে, কিছুদিন আগে পশ্চিম-মধ্য-ভারতে প্রাচীন মাহিষ্মতী নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। পণ্ডিতেরা বলেছেন যে, এই আবিষ্কার ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা মহা বিপ্লব এনেছে। কারণ মাহেন-জো-দাড়ো এবং হরপ্পা এই দুটি শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে এইটুকু শুধু প্রমাণিত হয়েছিল যে, পাঁচ ছ'হাজার বছর আগে অন্ততঃ সিন্ধুর তীরে তীরে একটা প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এতে, আমাদের প্রাচীন ঐতিহাসিক মতবাদ যেটা অর্থাৎ আর্যরা বাইরে থেকে এসে ঐ সিন্ধুর ওপারেই প্রথম তাদের সভ্যতা বিস্তার এবং উপনিবেশ স্থাপন করে, সেইটাই সমর্থিত হয়। কিন্তু মাহিষ্মতী একেবারে ভারতের মধ্যভাগে, সুতরাং এখানে যদি অন্ততঃ দু'হাজার বছরের পুরাতন একটি শহরের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয় তাহ'লে ইতিহাসটা একটু উল্টে পাল্টে যায় বই কি! এতদিন পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা ভারতবর্ষীয় সভ্যতাকে আড়াই হাজার বছরের বেশি বলে মানতেই চাইতেন না, তারপর রাখালদাসবাবুর যত্নে ও তদ্বিরে মাহেন-জো-দাড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ বার হতে অতি কষ্টে এইটুকু মেনেছিলেন যে, সিন্ধুর পশ্চিমে পাঁচ হাজার বৎসর আগে একটা সভ্যতা ছিল, তবে বাকি সারা ভারতবর্ষটা ছিল অন্ধকার। কিন্তু এইবার তাঁরা আরও ঘাবড়ে যাবেন। এত আগে মধ্য-ভারতে যখন এমন একটা রীতিমতো শহর গড়ে উঠেছিল তখন সে সময়ে

সারা ভারতটাই সভ্য ও সংস্কৃতিযুক্ত ছিল, এটা মানতেই হবে। খুব সম্প্রতি আবার সিন্ধুর এপারেও রাজপুতানার মধ্যে আর একটি ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে—যা অন্তত মহেন-জো-দাড়োর সমসাময়িক।

কিন্তু এ সব ত গেল ইতিহাসের কচকচি। আমরা ভাবছি কি জানো? ভাবছি, এতবড় শহরটা এমন করে মাটির নীচে চাপা পড়ে গেল কি করে? এ রকম শহর-কে-শহর মাটির নীচে বিস্মৃতির নীচে চাপা পড়ে যাবার ইতিহাস অবশ্য আরও আছে। প্রাচীন কাম্বোজ সাম্রাজ্যের রাজধানী হঠাৎ মেকং নদীর বন্যায় রাতারাতি জলাভূমিতে পরিণত হয়। মধ্য এশিয়ার কয়েকটি শহর, মরুভূমির বালুরাশির তলায় চাপা পড়ে যায় প্রাকৃতিক বিপ্লবে। পম্পিয়াই শহর বিসুবিয়াসের তরল ধাতু-স্রোতে ডুবে গিয়েছিল। মহেন-জো-দাড়ো শহরটিও হঠাৎ জলশূন্য হয়ে যায় প্রচণ্ড ঝড়ে কিংবা বন্যায় বালি চাপা পড়ে, এই রকম অনেকে অনুমান করেন। কিন্তু এখানে সে রকম কোন সম্ভাবনাই নেই, যেহেতু আশে পাশে এখনও অসংখ্য জনপদ আছে, শস্যশ্যামলা মাটি চারিদিকে। তবে শহরের কিছুটা পরিত্যক্ত হয়ে মাটি-চাপা পড়তে পারে, সেখান থেকে বর্তমান শহর একটু পাশে সরে যেতে পারে—যেমন কাশীতে বা দিল্লীতে দেখা যায়—হয়ত বা যেমন বৃন্দাবনেও হয়েছে, কিন্তু এমন করে শহরের চিহ্ন মাত্র মুছে যাওয়া সম্ভব হয় কি করে? শহর পুরানো হলে যে সবাই সেটা ছেড়ে একসঙ্গে চলে যাবে, এমন কখনও হয় না। কাশী ত কম পুরানো নয়, শুধু আমাদের দেশেই নয় অন্য সভ্য দেশেও যে

সব প্রাচীনতম পুঁথি পাওয়া যায় তাতে কাশীর উল্লেখ আছে। কিন্তু তবু কাশী আজও ত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

এক হতে পারে শত্রুর হাতে যদি ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকে, কিন্তু সে ইতিহাস কই? প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ঠিক ঐ শ্রেণীর বর্বরতা চলত না। যুদ্ধক্ষেত্রকে বলা হত ধর্মক্ষেত্র—অকারণ হত্যা কিংবা লুণ্ঠন তখন ক্ষত্রিয়রা ভাবতেই পারতেন না।

তবে?—

তবে যে গল্প বলছি শোন। ইচ্ছা হয় বিশ্বাস ক'রো, না হয় ক'রো না, কিন্তু যতক্ষণ না ঐতিহাসিকরা অন্য কথা বলেন বা প্রমাণ বার করেন, ততক্ষণ এই গল্পটা বিশ্বাস করতে দোষ কি?

সে অনেক দিনের কথা। পাণ্ডবরা যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন তখন নীলধ্বজ ছিলেন মাহিষ্মতীর রাজা। তাঁরই ছেলে প্রবীর অর্জুনকে বাধা দিতে গিয়ে অর্জুনের হাতে নিহত হয়। প্রবীরের মা জনা ছিলেন খুব বড় বীরাঙ্গনা। তখনকার দিনে ভারতের নারীরাও সকলের শ্রদ্ধা ও ভয়ের পাত্রী ছিলেন, জনাই তার বড় প্রমাণ। এই প্রবীরেরই কয়েক পুরুষ পরে এক রাজা মাহিষ্মতীর সিংহাসনে বসলেন, তাঁর নাম—ধরো, যুধাজিৎ। যুধাজিৎই মাহিষ্মতীর শেষ রাজা।

যুধাজিৎ সিংহাসনে বসে দেখলেন যে মাহিষ্মতী বড় ছোট রাজ্য—তাঁর মত এত বড় রাজার পক্ষে রাজ্যটা নিতান্ত ক্ষুদ্র। এর সঙ্গে আর একটা ছোট রাজ্যও যদি জুড়ে নেওয়া যায়, তাহলে তাঁর মর্যাদা অন্তত কতকটা রক্ষা পায়। কথাটা ভাবতেই তাঁর নজর পড়ল আশে-পাশের ছোট ছোট রাজ্যগুলির দিকে। তিনি

ভেবে দেখলেন যে, এক অবন্তী ছাড়া তাঁর দেশের কাছে আর তেমন কিছু নেই। অবন্তী রাজ্যের সীমা তাঁর সীমানার গায়েই লাগা, সুতরাং সবটা টেনে নিতে পারলে ব্যাপারটা মন্দ দাঁড়ায় না। তাছাড়া, মনে মনে একটা রাগও ছিল তাঁর অবন্তীর ওপর। ভাল তুলো মাহিষ্মতী আর অবন্তী এই দুটো দেশেই হ'ত তখন। কিন্তু মাহিষ্মতীর তুলোওয়ালারা ভাল দাম পেত না কোথাও অবন্তীর জন্য। অবন্তীর তুলো নাকি মাহিষ্মতীর চেয়ে অনেক ভাল অথচ দাম কম। এই সুযোগে সে শোধও নেওয়া হবে।

কথায় বলে দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। যুধাজিৎ অবন্তীর রাজাকে বলে পাঠালেন যে, যে-হেতু মাহিষ্মতীর তুলোওয়ালাদের মাল বিক্রীর বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে, সেই হেতু তিনি যেন আগামী দুই বৎসর তুলো উৎপাদনে বিরত থাকেন! আর তিনি যদি এটা না করেন তাহ'লে যুধাজিৎ বাধ্য হবেন অবন্তী আক্রমণ করতে।

বলা বাহুল্য, অবন্তীর রাজা এই অদ্ভুত প্রস্তাব আমল দিলেন না, বরং এটাকে ধৃষ্টতা বলেই মনে করলেন। যুধাজিৎ এই সুযোগই খুঁজছিলেন, অবন্তীরাজের এই জিদকে অন্যায় ও অসঙ্গত আখ্যা দিয়ে তিনি অবন্তী আক্রমণ করলেন।

কাজটাকে তিনি যতটা সহজ ভেবেছিলেন, যুদ্ধে নেমে দেখলেন মোটেই ততটা সহজ নয়। অবন্তী ঐটুকু দেশ বটে, কিন্তু তার শক্তি অসাধারণ। সৈন্যগুলোর অদ্ভুত সাহস, প্রাণের ভয় একেবারে নেই। তাছাড়া তাদের খরচও কম। মাহিষ্মতীর সেনারা রীতিমতো বাবু, তাদের খাবার চাই ভালো, পোশাক

চাই—বিছানার ব্যবস্থা চাই। অবন্তীর সেনারা ঘাস খেয়ে লড়াই করে। তাছাড়া ওখানকার প্রত্যেকটি লোক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দেশের স্বাধীনতা কিছুতেই যেতে দেবে না তারা! তাদের ভাব দেখে যুধাজিতের মনে হল যে, অবন্তীর একটি লোকও বেঁচে থাকতে অবন্তী জয় করার কোন সম্ভাবনা নেই। মাহিষ্মতীর সেনারা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে আগে দেখে কি করে তারা নিজেরা নিরাপদ থাকবে আর অবন্তীর সেনারা এসেই দেখে কি করে তারা শত্রুসৈন্য মারবে! নিজের কথাটা একবারও ভাবে না তারা। এমন লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায়?

যুধাজিৎ বিষম ফাঁপরে পড়লেন। সৈন্য নেই, রসদ নেই—এমনি একটা অবস্থা এসে দাঁড়াল এক সময়ে। এ যুদ্ধ জিততে এত সময় লাগবে তা ভাবেন নি আগে, সে রকম ভাবে প্রস্তুতও হননি। এখন হয়েছে কতকটা তাঁর মানের কান্না—তাও বোধ হয় তিনি নিজের সম্মান বিসর্জন দিয়েও যুদ্ধ ছেড়ে দিতেন, যদি না ভয় থাকত যে অবন্তীরাজ অত সহজে ছাড়বেন না। তিনি ওদের রাজ্যটা কেড়ে নিতে গিয়েছিলেন এ কথাটা অবন্তীর মনে আছে, সে প্রমাণ দেবে তারা মাহিষ্মতীটা কেড়ে নিয়ে।

এই যখন বিপদ, সেই সময়ে যুধাজিতের কানে গেল তাঁরই রাজধানীর একপ্রান্তে তপোবন কুটীরে বাস করেন রাঘবাচার্য, তিনি নাকি সূর্যরশ্মি থেকে কি এক অস্ত্র বার করেছেন! তাতে পলকে প্রলয় আন্‌তে পারে। একটা শহর ধ্বংস করতে সে অস্ত্রে এক মুহূর্তই যথেষ্ট!

কথাটা অবিশ্বাস্য, কিন্তু তখন আর অত বিবেচনা করার সময়

ছিল না। যুধাজিৎ তখনই নিজে গিয়ে হাজির হলেন রাঘবাচার্যের কুটীরে।

'আচার্য, এ কি সত্যি? আপনি এমন অস্ত্র আবিষ্কার করেছেন যা প্রলয় ঘটাতে পারে?'

আচার্য হাসলেন, সবিনয়ে বললেন, 'আমি কিছুই করিনি বৎস—এ অস্ত্র বহুদিনের। পাশুপাত অস্ত্রের নাম শুনেছ? শিব যা অর্জুনকে দিয়েছিলেন? এ সেই অস্ত্র। হঠাৎ আমার মনে হল যে, এ অস্ত্র বোধহয় তৈরী করা যায়! যা পড়াশুনা ছিল যৎসামান্য, তারই সাহায্যে লেগে গেলাম গবেষণায়, তারপর বহু চেষ্টা করে বহুবার বিফল হয়ে কৌশলটাকে আয়ত্ত করেছি। ঐ যে দেখছ যন্ত্রটি, ওর নাম মার্তণ্ডচক্র, ওতে করে সূর্যরশ্মির তেজ সংহত করা যায়, তা থেকে নানা রশ্মি ভাগ করে নিয়ে, বিচিত্র বস্তু ও শক্তির সংমিশ্রণে এই অস্ত্রটি তৈরী। এমন কিছু নয়, দেখবে বৎস? আমার প্রথম অস্ত্রটি সম্পূর্ণ হয়েছে—'

আচার্য সযত্নে এবং সস্নেহে এক বিচিত্র ধাতু-নির্মিত অস্ত্র তুলে দেখালেন। সামান্য একটা রম্ভার মত আকৃতি, সেই রকমই গঠন।

রাজা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এই অস্ত্রের এত শক্তি—তা এর প্রয়োগ-কৌশল কি?'

'কিছুই না।' হেসে বললেন আচার্য্য, 'একটি তীরের সঙ্গে একে আট্‌কে দূর থেকে শত্রুর দিকে ছুঁড়বে, তারপর সে তীরটি মাটিতে পড়বার আগেই নিপুণ হাতে আর একটি তীর মেরে এই ধাতুর বস্তুটিকে ফাটিয়ে দেবে—তাহলেই হল।'

রাজা তবুও বিস্মিত হয়ে আছেন দেখে আচার্য তাঁর মনের ভাব বুঝতে পারলেন। বললেন, 'এইটুকু অস্ত্রের এত শক্তি শুনে বিস্মিত হচ্ছ কেন বৎস? সূর্যরশ্মিই হচ্ছে পার্থিব সমস্ত শক্তির মূল। সেই রশ্মির সৃষ্টি করবার ক্ষমতা যেমন, ধ্বংসাত্মক শক্তিও তেমনি। আমি রশ্মির মধ্য থেকে মার্তণ্ডচক্র যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বংসাত্মক শক্তিটুকুই আলাদা করে নিয়েছি। তারপর সেই শক্তিকে নানা উপাদান এবং বিচিত্র প্রণালীর সাহায্যে বহু সহস্র গুণে শক্তিশালী করে তুলেছি। ঘর-বাড়ি মানুষ ত মোটা কথা মহারাজ, কয়েক কোটি পরমাণু দিয়ে একটি অণু নির্মিত, আবার কয়েক কোটি অণুতে একটি বালুকণা। আমার এই অস্ত্র সেই বালুকণাকে লক্ষ কোটি ভাগে বিভক্ত করে তার মধ্যের পরমাণুর প্রাণশক্তি পর্যন্ত হরণ করতে পারে!'

যুধাজিৎ মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে ছিলেন। সমস্তটা শোনার পর প্রণাম করে বললেন, 'ঐ অস্ত্রটি আমাকে দিতে হবে প্রভু!'

আচার্য যেন কতকটা ভয় পেয়েই তাড়াতাড়ি সেটা সরিয়ে নিলেন। বললেন, 'সে কি, তুমি ও অস্ত্র নিয়ে কি করবে?'

যুধাজিৎ বললেন, 'আপনি কি জানেন না যে আজ দু'তিন বছর অবন্তীর সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ চলেছে? মাহিষ্মতীর মান এবং প্রাণ দুই-ই যায় যায়! আপনার এই অস্ত্রে আপনারই দেশের শত্রু বিনষ্ট হবে।'

আচার্য বললেন, 'কিন্তু বৎস, তুমি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছ যে, পাশুপাত অস্ত্র দেবার সময় শিব অর্জুনকে বলে দিয়েছিলেন যে, একমাত্র দেবতা ও দানবের যুদ্ধেই তা প্রয়োগ করতে। সাধারণ
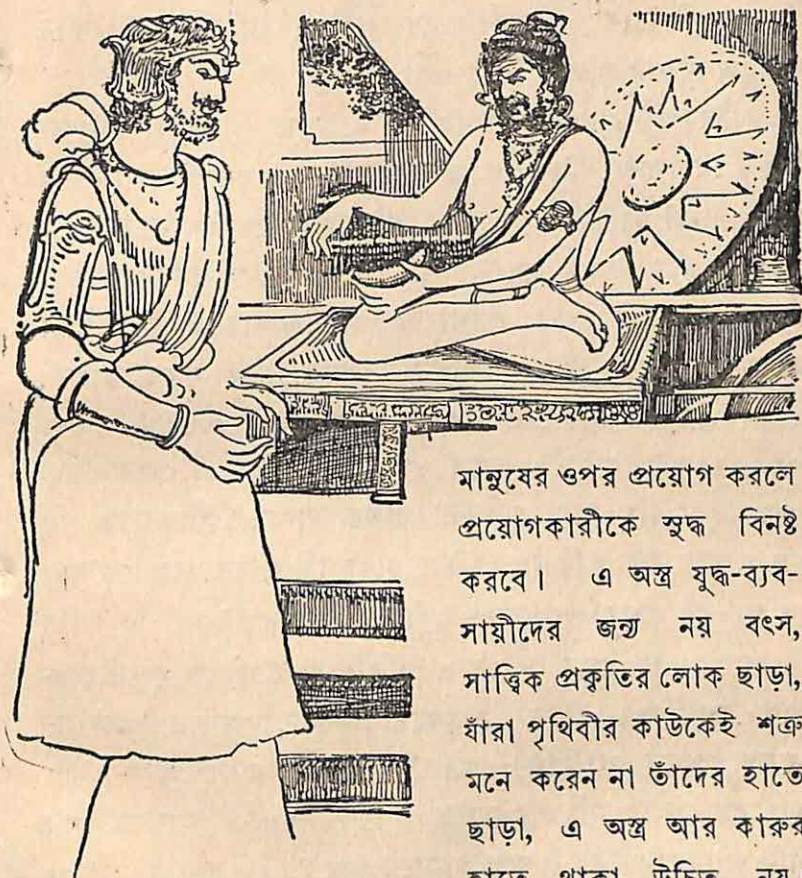
মানুষের ওপর প্রয়োগ করলে প্রয়োগকারীকে স্বুদ্ধ বিনষ্ট করবে। এ অস্ত্র যুদ্ধ-ব্যবসায়ীদের জন্য নয় বৎস, সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছাড়া, যাঁরা পৃথিবীর কাউকেই শত্রু মনে করেন না তাঁদের হাতে ছাড়া, এ অস্ত্র আর কারুর হাতে থাকা উচিত নয়। যে নিষ্কাম মনে মানবজাতির কোন বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য, রোষলেশশূন্য-চিত্তে এই অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে, সে-ই এ অস্ত্রের অধিকারী।'

অসহিষ্ণু যুধাজিৎ মাটিতে পা ঠুকে বললেন, 'অত বিবেচনার সময় আমার নেই। আপনার দেশ শত্রু-পদদলিত হবে এইটেই

কি আপনি চান? প্রত্যেক দেশবাসীরই উচিত, যে কোন কৌশলে দেশের শত্রুকে বিনষ্ট করা।'

কঠিন কণ্ঠে রাঘবাচার্য উত্তর দিলেন, 'যুদ্ধ তুমি বাধিয়েছিলে নিজের খেয়ালমত, নিজের শক্তি না বুঝেই। তখন কি আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলে? আজ সে হঠকারিতার ফল তোমাকেই ভোগ করতে হবে। যেমন করে পারো শত্রুকে তুমি পরাজিত করো। এ সব সামান্য ব্যাপারের জন্য আমার এ অস্ত্র নয়। এই অস্ত্রেই দেবাদিদেব প্রলয়কালে সমস্ত কিছু ধ্বংস করেন। এ থেকে যে কত কী হতে পারে, সে সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নেই। একটা বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস ত হবেই—এ থেকে সমস্ত দেশ, এমন কি সারা পৃথিবীর প্রলয় আসাও বিচিত্র নয়। এ অস্ত্র প্রয়োগ করা শক্তিমানের কাজ, সর্বত্যাগী ঋষির কাজ, তোমার মত স্বার্থপর ভোগবিলাপরায়ণ ক্ষত্রিয়ের কাজ নয়।'

অস্ত্রের গুণ শুনে লোভে ও প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিতে যুধাজিতের চোখ জ্বলছিল। তিনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'আপনার কাছে তত্ত্বকথা শুনতে আসিনি। আপনি আমার প্রজা, প্রজার সব জিনিসেই রাজার অধিকার আছে। বিশেষত এমন আপৎকালে। আমি আদেশ করছি, ঐ অস্ত্র আমাকে দিন।'

'কখনও না!' পাশুপত অস্ত্রটি বুকে চেপে ধরে রাঘবাচার্য বললেন, 'মানুষের এত বড় সর্বনাশ আমি প্রাণ থাকতে করতে দেব না। এ ত যুদ্ধ নয়, এতগুলো নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হবে—সে আমি হতে দেব না।'

অকস্মাৎ কোষ থেকে তরবারি খুলে নিয়ে যুধাজিৎ বললেন,

'আমার এবং আমার দেশের সম্মান এমন জায়গাতেই এসে দাঁড়িয়েছে যে, পাপপুণ্য, ন্যায়-অন্যায় বিচার করার সময় আর নেই। ও অস্ত্র আমার চাই-ই—আপনি যদি দেন ত ভালই, নইলে আমি জোর করে নেবো।'

রাঘবাচার্যেরও দৃষ্টি কঠিন হয়ে এল। তিনি বললেন, 'আমি ব্রাহ্মণ তা জানো?'

'কিছু জানবারই অবকাশ নেই। অতগুলি লোককে যে হত্যা করতে পারে, একটা ব্রহ্মহত্যাকে তার এমন কি বেশি ভয়?' কর্কশ কণ্ঠে বল্লেন যুধাজিৎ, 'দিন, আর অপেক্ষা করতে পারি না।'

রাঘবাচার্য পাশুপত অস্ত্রটি মুঠো করে ধরে বললেন, 'পাপিষ্ঠ, মনে রাখিস্ পাশুপত অস্ত্র এখনও আমারই হাতে। যদি প্রলয় আনতেই হয়, যদি প্রাণ দিতেই হয় ত আমিই তা প্রয়োগ করে যাবো।'

তিনি এর মধ্যে এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে মার্তণ্ডচক্রের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর অভিপ্রায় ঠিক কি ছিল তা ভেবে দেখা তখন সম্ভব নয়। নিজের প্রাণের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে যুধাজিৎ চক্ষের নিমেষে তরবারি বসিয়ে দিলেন রাঘবাচার্যের বুকে, তারপর তাঁর অনড় দেহ মার্তণ্ডচক্রের ওপর এলিয়ে পড়ার আগেই হাত থেকে অস্ত্রটি কেড়ে নিলেন।

আচার্য বিস্ফারিত চক্ষু অস্ত্রের ওপর নিবদ্ধ করে বার-দুই কী যেন বলতে গেলেন, তার মধ্যে শুধু 'প্রয়োগ' শব্দটা যুধাজিৎ বুঝতে পারলেন। হয়ত প্রয়োগের আরও কোন বিশেষ কৌশল

আছে, সেই কথাটাই আচার্য জানাতে চাইছিলেন। অনধিকারী যে, প্রয়োগ করতে গিয়ে সে পাছে কোন বিপদে পড়ে সেইটাই ছিল সেই শেষ মুহূর্তেও আশঙ্কা। যে অন্যায় ভাবে হত্যা করলে তার বিপদের কথাটাই অন্তিমকালে হয়ত ব্রাহ্মণের প্রথম মনে হয়েছিল, কিন্তু সে কথা জানাবার আগেই তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেল। বিজয়ের নেশায় উন্মত্ত মহারাজেরও তখন সেদিকে মন দেবার সময় ছিল না। তিনি তখনই রথে চড়ে বায়ুগতিতে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেলেন।

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে নিজের প্রাণের ভয়টা শেষ পর্যন্ত প্রবল হয়ে উঠলো। তিনি সে কথা গোপন করে এক সেনাপতিকে ডেকে মোটামুটি প্রয়োগবিধিটা বলে দিলেন। তারপর নিজে বহুদূরে গিয়ে বনের মধ্যে থেকে ফলাফল দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

শত্রুপক্ষের ব্যূহ ও শিবির অনেক দূরে। নিজেরা নিরাপদই আছেন ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে সেনাপতি অদ্ভুতকর্মা অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। যুধাজিৎ মনে মনে অস্ত্রের ফলাফল সম্বন্ধে সব চেয়ে বীভৎস যে ছবি এঁকে রেখেছিলেন, তার সঙ্গে কিছুই মিললো না—ঠিক কি দেখলেন তা অবশ্য তাঁর পক্ষে মনে করায় সম্ভব নয়, কারণ যা দেখলেন, তাতে মুহূর্তের মধ্যে স্থান-কাল-ঘটনার সমস্ত হিসাব মাথায় তালগোল পাকিয়ে গেল! মনে হল যেন এক সঙ্গে একই স্থানে সহস্র বজ্রপাত হল, আর সঙ্গে সঙ্গে বিরাট একটা অগ্নির সমুদ্র পর্বতপ্রমাণ ঢেউ তুলে উত্তাল হয়ে উঠলো! সেই প্রলয়ঙ্কর বহ্নিবন্যায় সারা পৃথিবীই যেন ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে!

রাজা আর দেখতে পারলেন না। যতদূর দৃষ্টি যায়, সেই আগুনের স্রোত দেখে তাঁর চোখ ঝাপসা হয়ে এল। তাছাড়া এক মুহূর্ত ছাড়া দেখার অবসরও পেলেন না, অস্ত্র নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে যে শত শত দানবের দাপাদপি শুরু হয়েছিল, সে যেন প্রলয়ের ঝড়! সেই প্রচণ্ড ঝড়ের ঘূর্ণিতে তাঁকে সেখান থেকে মহাশূন্যে উড়িয়ে সাত যোজন দূরে নিক্ষেপ করলে। তারই আঘাতে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

যখন জ্ঞান হল তখন দেখলেন যে, সর্বাঙ্গে ব্যথা, আঘাতে মাথা গা কেটে গেছে। চোখে এখনও ঝাপসা দেখছেন, কানে সেই প্রচণ্ড শব্দে যে তালা ধরেছে তা এখনও ছাড়েনি। কোথায় এসেছেন তা জানেন না, গভীর বনে পথ বলে দেবে এমন লোক নেই।

তবু তাঁকে উঠতে হল। ক্লান্ত অবসন্ন পা টেনে টেনে বনের ফল ও ঝরণার জল খেয়ে জীবনধারণ করে বহু পথ ঘুরে এক সময়ে মাহিষ্মতী যাবার পরিচিত পথ খুঁজে পেলেন। পথে যাদের সঙ্গে দেখা হল তারা কেউ এই ছিন্নবেশ ভিখারীকে রাজা বলে চিনতে পারলে না। যুধাজিৎও চেনা দিলেন না। এ অবস্থার কথা কেউ না জানে তাই ভাল। অবন্তীর সেনারা গেছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরও সমস্ত বাহিনী যে নিশ্চিহ্ন হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড তাঁরই অবিমৃষ্যকারিতায় ঘটেছে—কোন্ লজ্জায় তিনি মানুষের কাছে পরিচয় দিয়ে সাহায্য চাইবেন? তার চেয়ে এই ভাল। এই বিপদের সম্বন্ধেই খুব সম্ভব আচার্য সাবধান করতে চেয়েছিলেন—কিন্তু সে সব কথা ভাবতেও ভাল লাগে না।—থাক্!

যাই হোক—অবশেষে একসময় পথ চিনে চিনে মাহিষ্মতীর দ্বারদেশে পৌঁছলেন যুধাজিৎ। কিন্তু একি? নগরীর প্রবেশপথে ভিড় নেই কেন? জনতার চিহ্নমাত্র নেই, এ ত কখনও হয় না! এমন সকালে স্বার্থবাহের দল যে প্রবেশপথে ভিড় করে প্রত্যহ! তবে? প্রহরীরাই বা কোথায়? সমস্ত পুরী এমন প্রেতপুরীর মত নিঃশব্দ এবং স্তব্ধ কেন? তবে কি, তবে কি এখানে তাঁর মৃত্যু-সংবাদই এসে পৌঁছেচে, তাই পুরী এমন শোকার্ত?

তিনি জোরে জোরে এগিয়ে গেলেন। নগরীর মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন, সেখানেও কোন লোক নেই। জনহীন ত বটেই, সম্পূর্ণরূপে প্রাণিহীন; কুকুর বেড়াল এমন কি কাক পর্যন্ত কোথাও দেখতে পেলেন না। একি ব্যাপার? তিনি ঠিক মাহিষ্মতী-পুরীতেই এসেছেন ত? না কি কোন দানবসৃষ্ট মায়ালোকে এসে পড়লেন? না—ঐ ত বড়বাজারটা, ওটা ত বিশেষ পরিচিত তাঁর! কিন্তু বাজারেও কেউ নেই যে! ব্যাকুল হয়ে রাজা বাজারের মধ্যে ঢুকলেন!

সম্পূর্ণ জনহীন। প্রাণের লক্ষণ কোথাও নেই। কিন্তু এইবার একটা জিনিস তাঁর চোখে পড়ল! এতক্ষণ দেখেছেন কতকগুলো শুকনো কালো কালো কি পড়ে আছে পথের দু'ধারে, তবু লক্ষ্য করেন নি। এখন দেখলেন, আবলুসের মত কালো এবং এক হস্ত পরিমিত কতকগুলো পদার্থ, কিন্তু সেগুলো মনুষ্যাকৃতি। যেন মানুষই কী এক প্রচণ্ড তাপে শুকিয়ে, কুঁকড়ে, পুড়ে ছোট হতে হতে ঐ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে! বাজারের মধ্যেও ঐ রকম মূর্তি অসংখ্য। খালি বাড়ি যেগুলো খাঁখাঁ করছে, তার মধ্যেও—

অর্থাৎ তাঁর বড় সাধের মাহিষ্মতীপুরীর প্রজাদের ঐটুকু মাত্র চিহ্নই আছে। রাজা আর ভাবতে পারলেন না, তাঁর ধারণাশক্তি অবশ হয়ে এল। তিনি হা-হা করে হেসে উঠলেন।

যুধাজিতের আর ভয় নেই, তিনি পাগল হয়ে গেছেন! অনুশোচনা ও চিন্তা আর তাঁকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু ব্যাপারটা কি হয়েছিল জানো?

রাঘবাচার্যের দেহ মার্তণ্ডচক্রে পড়ে যন্ত্রের মুখটি যে আল্‌গা হয়ে গিয়েছিল তা রাজা তখন লক্ষ্য করেন নি। তার ফলে সূর্যরশ্মির সংহতশক্তি একটু একটু করে বেরিয়ে সমস্ত দেশ এমনিভাবে পুড়িয়ে দিয়েছে।

সুবর্ণের সন্ধানে

সে অনেকদিন আগেকার কথা। এখন থেকে অন্তত দুহাজার বছর তো বটেই।

ভারতবর্ষের পূর্বদিকে তোমাদেরই মতো একটি ছেলে ছিল—শান্তদাস বা সানুদাস তার নাম। তোমাদেরই মত তারও পড়াশুনো তেমন ভাল লাগত না, গুরুগৃহে বসে সামনে পুঁথি খুলে রেখে আন্‌মনে কী যেন সব ভাবত, চোখ থাকৃত দূরে বনভূমির দিকে। বকুনি খেত এর জন্য নিশ্চয়ই, তবু স্বভাব বদলায় নি।

কি ভাবত?

কি ভাবত, তা তাকে জিজ্ঞাসা করলে বোধ হয় সেও বলতে পারত না। শুধু এইটে জানত যে, এই শান্ত জীবন, এই নিয়মিত পড়াশুনো তার ভাল লাগে না। ঐ পরিচিত বনরেখার বাইরে যে পৃথিবী পড়ে আছে, তার এই ছোট গ্রামখানির বাইরেকার বিশাল পৃথিবী তাকে যেন অনবরত আকর্ষণ করে—নতুন দেশ, নতুন মানুষ দেখার নেশা তাকে পেয়ে বসে। কি হবে এই শুক্‌নো পুঁথির পাতা মুখস্থ করে?

হঠাৎ ওর কানে গেল গুরু পড়াচ্ছেন অন্য ছাত্রদের, 'এই যে জম্বুদ্বীপ, যার মধ্যে তোমরা বাস করছ, এর তিন দিক ঘিরে রয়েছে যে সমুদ্র, তার বুকে এরকম আরও বহু দেশ আছে। আমাদের কাছেই আছে অঙ্গদ্বীপ, যবদ্বীপ, শঙ্খদ্বীপ, কুশদ্বীপ, বরাহদ্বীপ, কৈরদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ, এমনি আরও কত! সমুদ্রের

বাধা প্রায় অলজ্ঘ্য কিন্তু যদি কোন দিন তোমাদের কেউ তাকে শাসন করতে পারো তো এইসব অচেনা দেশ দেখে এসো—'

সুবর্ণদ্বীপ!

শান্তদাস চম্‌কে উঠল। সুবর্ণ মানে তো সোনা। সে কি তবে সোনার দেশ? সবিনয়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল শান্তদাস, 'গুরুদেব, সুবর্ণদ্বীপ কি সত্যিই সোনা দিয়ে তৈরী?'

'না বৎস,' শান্তকণ্ঠে উত্তর দেন গুরুদেব, 'মাটিরই দেশ সেটা, তবে সেখানকার মাটিতে বালুকণায় নাকি সোনা মেশান আছে! সেই জন্যই তার নাম সুবর্ণদ্বীপ বা সুবর্ণভূমি।'

তিনি আবার ছাত্রদের পড়ায় মন দিলেন কিন্তু শান্তদাসের আর মন বসল না সেখানে। সে উঠে আশ্রমের বাইরে চলে এল একেবারে। সুবর্ণভূমি, সেখানকার মাটিতে সোনা আছে? না জানি সে কেমন দেশ! সে দেশ তো তাকে দেখতেই হবে, যেমন করে হোক। নইলে বেঁচে থাকাই বৃথা।

ঘর-বাড়ি ছেড়ে শান্তদাস বেরিয়ে পড়ল সেই দিনই। সোজা চলে গেল সে সমুদ্রতীরে, পথ জিজ্ঞাসা করে করে। সমুদ্র দুর্লজ্ঘ্য নয়। সে শুনেছিল যে, কি একরকম যান তৈরি করে কেউ কেউ সমুদ্রে পাড়ি দেয়, তারা ঘুরেও আসে প্রাণ নিয়ে। সেরকম কি কারুর দেখা পাবে না সে চেষ্টা করলে?

সমুদ্রতীরে পৌঁছেও সে পাগলের মতো হাঁটতে থাকে। প্রতিদিন আর কেউ সমুদ্রযাত্রা করে না, যদি-বা সেরকম কোন দুঃসাহসীর দেখা পায় তো—সে শান্তদাসের কথায় কান দেয় না। অজানা সমুদ্র, তার মধ্যে অচেনা দ্বীপ—পাগলের মতো

তো বকলেই হয় না! কে যাবে ওর কথা শুনে প্রাণ দিতে? সোনা? আমাদের দেশেই বা তার অভাব কি?

কিন্তু শান্তদাস তবু হাল ছাড়ে না। সমুদ্রতীর ধরেই ক্রমাগত দক্ষিণে এগিয়ে যায় সে। দিনের পর দিন কাটে—তবু হতাশ হয় না। পণ ওর দৃঢ়তরই হয়।

অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে একদিন দেখা হল ওরই মতো একদল ভবঘুরের সঙ্গে। তাদের সর্দার অচির সব কথা মন দিয়ে শুনলে। চোখ তারও জ্বলে উঠল কল্পনায় সেই সোনার দেশ দেখে। মন্দ কি? ঘুরেই আসা যাক্ না একবার! সোনার দেশে পৌঁছে মুঠি মুঠি সোনা তুলে বস্তা বোঝাই করবে ওরা—আর ওদের পায় কে!

সবাই মিলে চেষ্টা করে প্রাণপণে এক ভেলা তৈরি করলে। বিরাট ভেলা—ছোট-খাট জাহাজ একটা। তাতে নিলে খাদ্য আর জল—আর অস্ত্র। তারপর শুভদিন দেখে শীতকালের এক শান্ত দিনে বেরিয়ে পড়ল ওরা, উত্তরের বাতাসে পাল তুলে দিয়ে।

দীর্ঘ, বিপদসঙ্কুল পথ। দিক্-নির্ণয়ের ভাল যন্ত্র নেই। রাত্রে ভরসা ধ্রুবতারা—দিনে সূর্য। কোন মানচিত্র জানা নেই। ঝাপ্সা ঝাপ্সা ধারণা আছে একটা। দেশটা আছে কি নেই তাই বা কে জানে? ওরা চলেছে শুধু জনশ্রুতির ভরসা করে—শুনেছে যে, এত সহস্র যোজন দক্ষিণে গিয়ে এত সহস্র যোজন পূর্বে যেতে হবে। ঝড়-জল, খাদ্যাভাব—সব তুচ্ছ করে তবু ওরা

সেই জনশ্রুতির পথেই চলেছে। পিছনে ওদের কোন টান নেই—গতি ওদের সামনে। অজানাকে জানতে হবে, বিপদকে
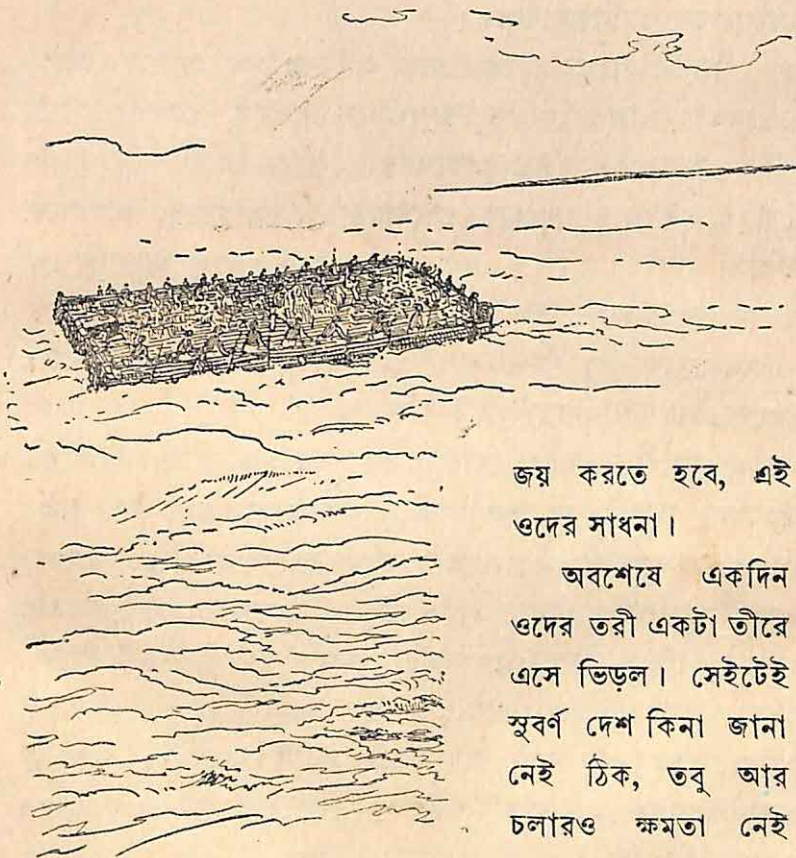
জয় করতে হবে, এই ওদের সাধনা।

অবশেষে একদিন ওদের তরী একটা তীরে এসে ভিড়ল। সেইটেই স্বুবর্ণ দেশ কিনা জানা নেই ঠিক, তবু আর চলারও ক্ষমতা নেই তখন। তাছাড়া, ওদের মন বলল, এইটাই সেই দেশ, যার জন্য জীবন পণ করে বেরিয়েছে—

নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা, উত্তুঙ্গ পাহাড় দিয়ে ঘেরা দেশ।

কাছাকাছি কোন মানুষ নেই—কোথাও কোন ঘরবাড়ির চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যায় না। হয়তো বা এই প্রথম মানুষের পায়ের ছাপ পড়ল ওর সমুদ্রবেলায়!

সেই পাহাড়ের দিকে চেয়ে অচিরের মুখ শুকিয়ে উঠল। এখানকার বালুকণায় তো অন্তত সোনা নেই, ভেতরে আছে কিনা কে জানে! কিন্তু ভেতরে যায় কেমন করে ওরা? পথ কৈ? এই খাড়া পাহাড় পেরোতে পারলে হয়তো পথ আছে, হয়তো সোনার মাটিও দেখা পাবে কিন্তু পাহাড়ের বুকে তো কোন পথ নেই!

শান্তদাস তবু দমল না। ও অচিরকে অভয় দিয়ে বললে, 'রসো। আমি ব্যবস্থা করছি।'

সে জাহাজ থেকে গোটা-কতক বড় বড় গজাল পেরেক জোগাড় করে নিয়ে এল। আর আনল খানিকটা লম্বা দড়ি। পাহাড়ের বুকে প্রাণপণে একটা করে পেরেক পোঁতে, তারপর সেই পেরেকে দাঁড়িয়ে আরও উঁচুতে পেরেক পোঁতে, আবার তাতে দাঁড়িয়ে নিচের পেরেকটা খুলে নিয়ে ওপরে পোঁতে। এমনি করে ও চলে এগিয়ে। ওর কোমরের সঙ্গে দড়িটা বাঁধা আছে, সেই দড়ি ধরে ধরে বাকী সবাই এগোয়। কারুরই পড়ে যাবার সম্ভাবনা নেই, পা পিছলে গেলেও দড়ি ধরে সামলে নেয়।

এইভাবে অতিকষ্টে শেষ পর্যন্ত ওরা পাহাড় পার হল। কষ্টের শেষ নেই—এক এক জায়গায় এমনও ছিল যেখানে পেরেক পুঁতে দাঁড়ানো যায় না; সেখানে চার হাত-পা দিয়ে পাথর

আঁকড়ে বুকে হেঁটে হেঁটে পার হতে হয়। কোথাও বা পাহাড়ের বেত-ঝোপের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে সেই বেত ধরে ধরে এগোয়। কিন্তু অত কষ্ট করে এপারে এসে যা দেখলে তাতে মুখ শুকিয়ে গেল। পাহাড়ের ঠিক নিচে দিয়ে খরস্রোতা পাহাড়ী নদী বয়ে চলেছে। ওরা জাহাজ থেকে ভেলা তৈরীর কোন সরঞ্জামই নিয়ে আসেনি, তা ছাড়া যা স্রোত, কোন ভেলাই টিক্‌ত না।

এখন উপায় ?—

শান্তদাসই উপায় বলে দিলে। নদীর ওপারে নিবিড় বাঁশবন। বিরাট বাঁশগুলো ঝড়ের বেগে এক-একবার নদীর ওপরে নুয়ে পড়ছে আবার পরক্ষণেই সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নুয়ে পড়বার সময় তাদের ডগাগুলো এপার পর্যন্ত চলে আসছে এক-এক সময়। ওরা সেই মুহূর্তকাল সময়ের সদ্ব্যবহার করলে, অর্থাৎ চকিতের মতো যেমন বাঁশগুলো নুয়ে পড়ে, ওরা তার ডগা চেপে ধরে আবার ওপরে গিয়ে সোজা হতেই নেমে পড়ে।

এত কাণ্ড করে তো ওপরে যাওয়া হল—কিন্তু সে সোনার দেশ কৈ ? সমতল ভূমিও তো বেশি নেই, এপারেও একটু এগিয়ে গেলেই আবার পাহাড়। সমস্ত দেশটাই যেন পাহাড়ে তৈরী ! অবশ্য খাবারের অভাব নেই, ফল-মূল ঢের—তবু এমন করে কত কষ্ট করা যায় ? যাই হোক্, এবার অচিরের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। এপারে কতকগুলো বুনো ছাগল চরছিল—বড় বড় বুনো পাহাড়ী ছাগল। কতকগুলো বুনো ছাগল ধরে ওরা তাইতে চেপে বসল, ছাগলগুলো ওদের নিয়ে অনায়াসে পাহাড়ে উঠতে লাগল। তারা পাহাড়ে ঘোরে, কাজেই যেটা

মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর, তাদের কাছে তা অনায়াসসাধ্য। ফলে এবার ওদের পা একটু বিশ্রাম পেলে—ভ্রমণের আনন্দ একটু একটু পেতে লাগল ওরা।

এমনি করে সারাদিন চলে সন্ধ্যার ঠিক আগে এক মহাবিপদে পড়ল বেচারীরা। জনমানবহীন দেশে এতক্ষণ ওরাই ছিল সর্বেসর্বা, অকস্মাৎ নির্জন শান্ত সন্ধ্যায় পাহাড়ের বুকে প্রতিধ্বনি জাগল—মানুষের কণ্ঠস্বর না? ওদের গলা নয়—এ যে সম্পূর্ণ অপরিচিত গলা। আর একদল মানুষ কি তাহ'লে এসেছে এখানে, ওরা ছাড়াও?

হ্যাঁ—ঐ যে! ওরা আসছে বিপরীত দিক থেকে। এর একদল, ওদেরই মতো বোধ হয় সোনার সন্ধানে এসেছে!

অচিরের দৃষ্টি ক্রূর হয়ে উঠল। সে হুকুম দিল, 'মারো ওদের, এত কষ্টের পর সোনার ভাগ দিতে পারবো না!'

শান্তদাস ওদের শান্ত করবার চেষ্টা করলে; কোথায় সোনা তার ঠিক নেই, মিছামিছি মানুষ মেরে লাভ কি? এতবড় দেশ, ওরা আছে, থাক্ না! কিন্তু অচির কোন কথাই শুনলে না, ওর তখন মাথায় খুন জেগেছে—কোন প্রতিদ্বন্দ্বী সইতে ও রাজী নয়।

তাই হল। তাদের দলে ছিল কম লোক—অচিরের দলের সঙ্গে পারলে না তারা। এরা তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিলে ক্ষীণ পার্বত্য পথের পাশে যে অতলস্পর্শী খাদ, তারই মধ্যে। তাদের আর কোন চিহ্নও বোধ হয় রইল না!

এই অকারণে নরহত্যা শান্তদাসের ভাল লাগল না। অথচ উপায়ও নেই, সে একা কি করতে পারে?

সে রাতের মতো ওরা, সেইখানেই শুয়ে পড়ল। শুকনো পাতায় আগুন জ্বেলে বেড়া করে দিলে। ছাগলগুলো লতাপাতায় বাঁধা রইল। পরের দিন ভোরে ঘুম ভাঙ্গতেই এক অপূর্ব দৃশ্য ওদের চোখে পড়ল। প্রথমে মনে করেছিল মেঘ, কিন্তু পরে দেখলে যে না—কি এক জাতের বিশাল পাখি তাদের বিপুল ডানা মেলে আকাশ অন্ধকার করে উড়ছে! কতকটা শকুনের মতো—তবে আরও অনেক বড়।

হঠাৎ অচিরের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে বললে, 'ঐ ছাগলগুলোকে মেরে ফেলা যাক্—তারপর ওদের ছাল ছাড়িয়ে ছালটা পিঠে বাঁধা যাক্। লোমের দিকটা থাকবে ভেতরে, কাঁচা মাংসের দিকটা থাকবে ওপরে।'

শান্তদাস তো অবাক! তাতে কি হবে?

অচির হেসে বলল, 'বোকারাম, তাও বুঝলে না? ওপর থেকে ঐ পাখিগুলো তখন আমাদের দেখে মনে করবে মাংসের ডেলা—খাবার মনে করে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে বাসায় ফিরবে। তার ফলে ওই পাহাড়গুলো পার হওয়া যাবে অনায়াসে, হয়তো ওরা যেখানে নিয়ে গিয়ে ফেলবে সেইখানেই সোনা আছে, নইলে ওপর থেকে আমরা তো দেখে নিতে পারব দেশটার কোথায় কি আছে!'

সকলেই এ প্রস্তাবে উৎসাহিত হয়ে উঠল। হ্যাঁ, বুদ্ধি বলে তো এই। খালি শান্তদাসের একটু কষ্ট হল ছাগলগুলোকে মারতে—বেচারীরা কাল থেকে মুখ বুজে সারাদিন তাদের বয়েছে, অকারণে মারা হল বেচারীদের।

যাই হোক, সবাইতো পিঠে সেই 'আমচর্ম' (কাঁচা ছাল) বেঁধে প্রস্তুত হয়ে বসল। দেখা গেল অচিরের হিসাবে কিছুমাত্র ভুল হয়নি। একটু পরেই সেই বড় বড় পাখিগুলো ডানার ঝাপটে চারিদিকে যেন ঝড় তুলে এসে নামল এবং একে একে মুখে করে তুলে নিয়ে আবার আকাশে উঠল।

এর পর দলের বাকী লোকের কি হল তা শান্তদাস জানে না। কেন না আর কারুর সঙ্গে তার দেখা হয়নি—তার ভাগ্য এর পর তাকে উড়িয়ে নিয়ে ফেললে বিচিত্র এক ভবিষ্যতের মধ্যে!

ও তো উঠল আকাশে, এর মধ্যে ভরসা করে ও চারিদিক তাকিয়ে দেখবার আগেই, আর এক পাখি খাদ্যের লোভে এসে করলে সেই পুরোনো পাখিটাকে আক্রমণ। বিষম ঝটাপটি, খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি আর তার ফলে এক সময়ে কার নখের আঘাতে ওর চামড়া গেল কেটে, এবং শান্তদাস সেই মহাশূন্য থেকে পড়তে লাগল নিচে।

সে একবার তার মাকে স্মরণ করলে, আর গুরুদেবকে। মৃত্যু তো অনিবার্য, এত উঁচু থেকে পড়লে কি আর মানুষ বাঁচে?

কিন্তু ঈশ্বর ওর উপর প্রসন্ন—শান্তদাস ম'ল না। মাটিতে বা পাহাড়ে না পড়ে ও গিয়ে পড়ল জলে। বিশাল এক শান্ত সরোবর, অজস্র পদ্মের মেলা, তারই মধ্যে পড়ে আবার ও ভেসে উঠল। সাঁতার ভালই জানত, সুতরাং একটু চেষ্টা করেই তীরে এসে পৌঁছল।

এইবার সে ভাল করে চারিদিকে চেয়ে দেখলে। কী সুন্দর

দেশ, কী মনোরম দৃশ্য! চারিদিকে প্রকৃতির কী অজস্র দান! আহা, স্থবর্ণভূমি যদি এরই নাম হয় তো সার্থক নাম!

কিন্তু ও কি!

শান্তদাস চম্‌কে উঠল। ও কার কুটির ঐ দূরে? এখানে তাহলে মানুষ আছে! তারও আগে এসেছে?

কী করবে ভাবছে, এমন সময়ে কুটীরের দ্বার খুলে বেরিয়ে এলেন জটাজূটধারী এক ঋষি—মুখে তাঁর অভয় হাস্য, দৃষ্টিতে প্রসন্নতা।

তিনি কাছে এসে ওরই মাতৃভাষায় শান্তদাসকে সম্বোধন করে বললেন, 'বৎস, আমি তোমারই অপেক্ষা করছিলাম। জানতাম তুমি আসবে।'

শান্তদাস তাঁকে প্রণাম করে বললে, 'প্রভু, এই কি তাহ'লে স্থবর্ণ দ্বীপ?'

'হাঁ, এই স্থবর্ণ দ্বীপ।'

'কিন্তু—কিন্তু, তাহলে সোনা কোথায়?'

'মাটি এখানকার সোনা নয়—কিন্তু এ সোনার মাটি বৎস! এদেশে যা আছে তা কোথাও নেই। আর সেইজন্যই তোমার এখানে আগমন। তুমি এই বার্তা বয়ে নিয়ে যাও তোমার দেশে—ভারতভূমিতে। সেখানকার অধিবাসীদের জন্যই এই সোনার দেশ তার বিপুল ঐশ্বর্য-সম্ভার নিয়ে বসে আছে। এখানকার ইতিহাস রচনা করবে ভারতবাসী—বাণিজ্য-পথ ধরে আসবে তারা, ক্রমে বিশাল এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলবে। তুমি সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উপলক্ষ্য মাত্র। যাও বৎস, দেশবাসীকে এর সন্ধান

দাওগে। ভারত মহাসমুদ্রের বুক যেন বাণিজ্যতরীতে ঢেকে যায় একদিন! আমি এরই প্রতীক্ষায় বসে ছিলাম।’

সেই ঋষিই পথ দেখিয়ে দিলেন শান্তদাসকে, ব্যবস্থা করে দিলেন ভারতবর্ষে ফিরে আসার।

দেখতে দেখতে এই বার্তা ছড়িয়ে পড়ল দেশ থেকে দেশান্তরে, জম্বুদ্বীপের সর্বত্র। বড় বড় বাণিজ্যতরী যাত্রা করল সেই সুবর্ণ দ্বীপের সন্ধানে—সেখানকার মাটিতে সোনা ছড়ানো না থাকলেও, সোনা সেখানকার মাটিতে সত্যিই ফলে।···

তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী যেমন কেটেছে, ভারতবাসীর এক বিরাট্ উপনিবেশ, এক মহাশক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে সেখানে। শৈলেন্দ্রবংশীয় নরপতিদের প্রতাপে শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের খ্যাতি সুদূর চীন থেকে আরব পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে একদা। কিন্তু সে অন্য গল্প। ভারতবাসীদের সে গৌরবময় ইতিহাস তোমরা এর পর প’ড়ো। জাভা, সুমাত্রা, মালয়, বালি, বোর্নিও, শ্যাম, ইন্দোচীন—একদিন তোমাদেরই উপনিবেশ ছিল, সেখানকার সাম্রাজ্য ও শক্তি তোমাদেরই পূর্বপুরুষ একদিন গড়ে তুলেছিলেন—এইটুকু শুধু জেনে রাখো এইখানে।

কথাটা ভাবতেও ভাল লাগে, না?

সত্যদাসের নব-জন্ম

সত্যদাস অমন হঠাৎ মারা যাওয়াতে প্রথমটা সকলেই চম্‌কে উঠেছিল বৈকি! সারাদেশ জুড়ে সে যেন এক বিরাট হৈ-চৈ সোর-গোল!

আমাদের দেশের প্রান্তে সে দেশ, হিমালয়ের দক্ষিণে। নাম? নামটা না-ই বা শুনলে সে-দেশের। ধরো, তার নাম মিথ্যাপুর! হ্যাঁ, এই নামই ভালো। কারণ, ওটা তো আর সত্যিকারের নাম নয়, সবটাই যখন মিথ্যা তখন মিথ্যাপুরই ধরে নেওয়া যাক না। আর সে দেশের মানুষগুলোও যখন অত বেশী মিথ্যা বলে, তখন ও নামটা খুব বেমানান হবে না। তারা শুধু মুখেই মিথ্যা বলে না—সমস্ত কাজে, সমস্ত আচরণেই তাদের মিথ্যা যেন জ্বল্ জ্বল্ করে! মুখে যখন ভালো ভালো বক্তৃতা করে, তখন মনে ভাবে খারাপ কাজ। খাঁটি দুধ বলে জল বেচে; ঘি বলে বিক্রী করে তুলোর বীচির তেল। কোন জিনিসই সে দেশের বাঁধা-দামে পাওয়া যায় না—চারগুণ, আটগুণ, এমন কি, বারোগুণ দাম দিতে হয়। ঘুষ না দিয়ে কিম্বা সুপারিশ না ধরে সে-দেশে কেউ কোন কাজ করতে পারে না। সোজা-পথে চলা আর সোজা-কথা বলা দেশের লোক বহুকাল ভুলে গেছে।

সে-দেশের বালকরা পরীক্ষায় পাশ করে টুকে, কিম্বা পরীক্ষকদের সুপারিশ ধরে। যুবকরা কর্মক্ষেত্রে দেয় ফাঁকি, আর বৃদ্ধরা চেষ্টা করে, স্বয়ং ভগবানকে ঠকাতে। জপ কিম্বা পূজো, বড় জোর উপোস-এর আড়ালে তারা তাদের অসৎ কাজ

ও অসৎ-চিন্তা ঢাকতে চেষ্টা করে। সে দেশের জমিদার প্রজাকে এবং প্রজারা জমিদারকে ঠকায়। রেলের লোক চেষ্টা করে যাত্রীদের ঠকাতে, আর যাত্রীরা চেষ্টা করে রেলকে ফাঁকি দিতে। সব চেয়ে হয়তো অবাক হয়ে যাবে একটা কথা শুনলে—সেখানকার ছাত্ররা পর্যন্ত শিক্ষককে ঠকাবার চেষ্টা করে, শিক্ষকরা চেষ্টা করে ছাত্রদের ঠকাতে। কাজেই, এ হেন দেশের নাম যদি মিথ্যাপুর দিই, খুব অন্যায় হবে কি ?

এমন মিথ্যাপুরে সত্যদাসের জন্মটাই আশ্চর্য, আরও আশ্চর্য এই যে, তিনি সত্যিসত্যিই সত্যদাস হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। অবশ্য বেশীদিন যে তাঁকে ওখানকার লোক সহ্য করতে পারবে না, এ আমরা সবাই জানতাম। আর হলোও তাই! সত্যদাসের চেষ্টাতেই যখন দেশের সুখ শান্তি সমৃদ্ধি ফিরে এলো, তখন দেশেরই একজন লোক তাঁকে অতর্কিতে খুন করে বসলো। অন্ধকারে থাকতে যারা অভ্যস্ত, আলো তাদের সইবে কেন? প্যাঁচার সব-চেয়ে বড় শত্রু হলেন সূর্যদেব—যাঁর আলো থেকে আমরা সবাই, এমন কি প্যাঁচারা পর্যন্ত, প্রাণ-শক্তি পাচ্ছি। প্রতিটি খাদ্য তৈরি হচ্ছে যা-থেকে প্রাণ আহরণ করে, প্রতিটি ফুল ফুটছে যার দয়ায়, সেই সূর্য-কিরণকে, পরিহার করে চলে এমন প্রাণীর ত অভাব নেই!

মিথ্যাপুরের রাজারা হলেন শ্বেত-দ্বীপের লোক। ওখানকার সিংহবংশীয়রাই প্রতিনিধি রেখে রাজত্ব চালাতেন। তাঁরা এদেশে আসেনও একদিন মিথ্যার দৌলতে—মিথ্যাকে, শঠতাকে আশ্রয় করেই রাজ্যটাকে ধরে রেখেছিলেন এতকাল। তাঁদের প্রশ্রয়েই

দেশে পাপ এমন করে বেড়ে উঠেছিল ; তাঁরা জানতেন এদেশে মানুষ নেই, যা খুশী আর যত খুশী অত্যাচার করুন না কেন, এরা সবই সইবে। তাঁরা এদের এমনই দমিয়ে রেখেছিলেন ভয় দেখিয়ে যে, প্রথমটা সত্যদাসের কথায় বা কাজে তাঁরা একটুও ঘাবড়ে যাননি, বরং হেসেছিলেন। তারপর যখন দেখলেন যে, সত্যদাস বড়ই গোলমাল বাধাচ্ছে, তখন তাঁরা এদিকটায় খুব জোর দিলেন। পাইক-পেয়াদা বরকন্দাজের অত্যাচারে চারিদিকে হাহাকার উঠলো। কত লোক যে বিনা দোষে শাস্তি পেলে তার ঠিক নেই। স্বর্গত রাজা চতুর-চিল্লসিং বিপুলবিক্রম সত্যি-সত্যিই খুব চতুর ছিলেন—তাঁর বিক্রমও ছিল কম নয়, কিন্তু আগেই বলেছি—তাঁদের যা কিছু বুদ্ধি আর কৌশল, সবই চলতো মিথ্যার পথ ধরে। তাই, যখন তিনি বাঁধন শক্ত করতে চেষ্টা করেন, ততই তা সত্যদাসের সত্যে লেগে আল্‌গা হয়ে যায়। যত অস্ত্র সব তাঁর সত্যের বর্মে ঠেকে ফিরে আসে—পাইক-পেয়াদা-বরকন্দাজের হাতের অস্ত্র নিরস্ত্র এবং অহিংস সত্যদাসকে দেখে আপনিই যেন খসে পড়ে।

অবশেষে এমন অবস্থা হলো যে, শ্বেত-দ্বীপের লোকেরাই রাজার ওপর চটে গেল এই অত্যাচারের জন্য। তাদের রাজা তাদের হাতেই নিহত হলেন একদিন—নতুন যিনি এলেন রাজা হয়ে, তিনি বললেন, 'আর দরকার নেই ওখানে আমাদের রাজত্ব করে,—ও দেশ সত্যদাসই নিক!' শেষ রাজপ্রতিনিধি সিংহ-বংশীয়দের দণ্ড ও মুকুট, সত্যদাসের পায়ের সামনে রেখে বললেন 'তোমারই জয় হয়েছে সত্যদাস! এ মুকুট—তোমার।'

সত্যদাস বললেন, 'মুকুটে আমার কাজ নেই, দণ্ডতেও না। যারা দেশের সত্যকার কল্যাণ চায়, দেশের উন্নতির জন্য এতকাল কষ্ট স্বীকার করে এলো—তারাই নিক্। আমি যেমন আছি, তেমনই থাকি!'

সত্যি, অদ্ভুত মানুষ ছিলেন সত্যদাস। সমস্ত পৃথিবী যা বলে, তিনি বলেন তার উল্‌টো। চিরকাল সবাই জেনে এলো যুদ্ধ করতে হয় অস্ত্র দিয়ে; উনি বললেন—'অস্ত্র না নিয়ে যুদ্ধ করাটাই সব-চেয়ে বড় বীরের কাজ। অহিংসাই হলো আসল অস্ত্র।' সবাই জানে, জোর যার মুল্লুক তার; উনি বললেন, 'সে জোর—গায়ের নয়, সে জোর—মনের।'

বলতেন, 'বাপু হে, আগে মানুষ যুদ্ধ করতো পাথর দিয়ে, তারপর এলো লোহার অস্ত্র—তলোয়ার বল্লম বর্শা তীর ধনুক—তখন এইসব দেখলেই লোকে ভয় পেতো। কিন্তু কামান বন্দুক যখন এলো, তখন ওগুলো মানুষ অকেজো বলে ফেলে দিলে। আবার আগেকার বন্দুক কামান কিছুদিন পরে ছেলের হাতের খেলনা হয়ে উঠলো—লোকে বাড়ী বাগান সাজাতে সুরু করলে তা দিয়ে—এমন সব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর নতুন অস্ত্র বেরোলো! এলো বোমা, তা থেকে আণবিক-বোমা, আবার আলোক বোমা, বীজাণু বোমা, কতো কি শুনছি! কাজেই, কতকগুলো অস্ত্র তৈরী করলেই কি নির্ভয়ে থাকতে পারবে? তার চেয়েও শক্তিশালী অস্ত্র তৈরী হতে কতক্ষণ? বরং যদি সমস্ত-রকম অস্ত্রের সামনে প্রাণ তুচ্ছ করে দাঁড়াতে পারো,

দেখবে, অস্ত্র আপনিই খসে পড়বে অস্ত্রধরদের হাত থেকে। নিরস্ত্র লোককে আঘাত করতে খুব বড় অত্যাচারীও ইতস্তত করে।

এমনি করে, সমস্ত পৃথিবীর লোক যখন কলকারখানা নিয়ে মেতে উঠল, এমন কি, আমাদের ভারতবর্ষেও কলকারখানা ছাড়া চলবে না একথা সবাই মেনে নিলে, ওখানে তখন সত্যদাস বললেন, 'উহু, উহু! তা নয়। কলে দরকার নেই, চাষবাস করো, নিজেদের খাবার নিজেরা তৈরী করো, হাতে সুতো কেটে কাপড় বুনে নাও, জুতোর চামড়া মরা জন্তুর থেকে নিজেরা ঘরে পাকিয়ে তৈরী করে নাও। কলকারখানা নিয়ে কি হবে? বিলেতে তো অত কলকারখানা, কিন্তু খাবারের জাহাজ না গেলে উপোস করে থাকতে হয়, তুলো না গেলে কাপড় হয় না। খাবার যদি নিজের দেশে না থাকে তো, হাজার পয়সা থাক্, এক-এক সময় উপোস করতেই হয়। তখন তো আর কলকারখানা চিবোতে পারবে না! কলকারখানাতে অল্পসময়ে বেশী জিনিস হয় মানি—কিন্তু বেশী জিনিসে আমাদের দরকার কি? যে-যার কাপড় যদি তৈরী করে নিই, তাহ'লে কেনবার প্রয়োজন থাকে না। বিজ্ঞান যত বিলাস বা আরামের বাজে জিনিস আমদানী করছে, তাতে আমাদের কী উপকার হচ্ছে বলতে পারো? আমরা আরো আরাম চাইছি, আরো বাজে-জিনিসে ঘর ভরাচ্ছি। আসল প্রয়োজন কতটুকু? খাওয়া এবং পরা। কলকারখানা থাকলেই অল্পসময়ে বেশী জিনিস হবে, তখন তা আর নিজেদের দরকারে লাগবে না, কাজেই বেচতে চেষ্টা করবো, সহজে খদ্দের না পেলে জোর করে বেচবো, আর তাই নিয়েই তো দুনিয়াতে যত অশান্তি, যত যুদ্ধ।'

সত্যদাসের কথা কেউ মানতো, কেউ মানতো না। যারা মনে-প্রাণে মানতো না (তাদের সংখ্যাই বেশী) তারাও অনেকে কাজের সুবিধার জন্য মুখে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু সত্যদাস যখন তাদের স্বাধীনতা এনে দিলেন, হাতে-কলমে কাজ করবার সময় এলো—তখন আর সেভাবে কাজ করতে চাইলে না কেউ। বললে, সারা পৃথিবী যেদিকে যাচ্ছে, আমাদেরও সেইদিকে যেতে হবে। নইলে বাঁচবো কী করে? সব তাইতে পাগলামী করলে তো আর চলবে না! যা কেউ পারলে না, বুদ্ধ না, যীশু না, গান্ধী না—সত্যদাস তাই পারবেন? পাগল, না, মাথা খারাপ?

সত্যদাস ওদের ব্যাপার দেখে দুঃখিত হলেন, কিন্তু হাল ছাড়লেন না। যাদের উনি একান্ত আপনার লোক বলে ভাবতেন, তারাও যখন এমনি কপটতা করলে, তখন উনি একাই ঘুরে বেড়াতে লাগলেন দেশ থেকে দেশান্তরে। বলে বেড়াতে লাগলেন, 'বর্তমান সভ্যতা মানেই মিথ্যা—তাতে কখনও শেষ পর্যন্ত ভালো হবে না, ঝগড়া-ঝাঁটি দলাদলিতে দুঃখ বেড়েই যায়, কখনও কেউ সুখী হয় না। প্রয়োজন বাড়িও না, স্বাবলম্বী হও, মানুষকে ভালোবাসো—তাহ'লেই সুখে থাকবে।'

প্রথমটা সবাই ভেবেছিল, ওঁর দিন চলে গেছে, আর ওঁর কথাতে কেউ কান দেবে না। কিন্তু যখন দেখলে, সাধারণ প্রজারা এখনও ওঁর দিকে আছে, এমনভাবে চললে মহা অসুবিধে হবে—তখন দেশের একদল লোক, উনি বেঁচে থাকলে যাদের অসুবিধা, তারাই ষড়যন্ত্র করে মেরে ফেললে।

সত্যদাসের যে সব ভক্ত ও শিষ্যরা মিথ্যাপুরের শাসন চালাচ্ছিলেন, তাঁরা প্রথমটা ওঁর মৃত্যুতে, খুব হাহাকার করে উঠলেন। মুখে বললেন, 'উনি চলে গেছেন, কিন্তু ওঁর আদর্শ ত আছে—সেইভাবেই কাজ করবো আমরা।' ফলে যে সব প্রজাদের মনে একটু অসন্তোষ জমছিল তারাও শান্ত হয়ে গেল। কিন্তু এখন তো সত্যদাস বেঁচে নেই, সুতরাং শাসনকর্তাদের খুব সুবিধা হলো—যাঁর যা খুশি তাই করতে লাগলেন, লোককে বললেন, 'এ তাঁরই ইচ্ছামত করছি।' আবার যারা চাইলে ওঁদের সরিয়ে দিয়ে শাসন-ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিতে, তারাও সত্যদাসেরই নাম করে দল পাকিয়ে বেড়াতে লাগলো। হায়, যাঁর নামে এই মিথ্যা বেসাতি চললো, সেই সত্যদাসের কণ্ঠ যে নীরব, কে প্রতিবাদ করবে?

এমনি করে আর-পাঁচটা দেশের মতই মিথ্যাপুর—সভ্যতার দিকে এগিয়ে চললো। কলকারখানাতে দেশ ভরে গেল, চিমনীর ধোঁয়াতে আকাশ অন্ধকার হয়ে উঠলো। অস্ত্রের কারখানাতে নানারকমের মারণাস্ত্র জমে উঠলো, সৈন্যদলে সবাইকে ধরে জোর করে নাম লেখানো হলো। মনে হলো এইবার মিথ্যাপুর মাথা তুলে দাঁড়াবে জগতের মাঝে, তার প্রতাপে অপর দেশ কাঁপবে এইবার। সত্যদাসের কথাই ভুল—এমনি একটা ধারণাও লোকের মনে হতে লাগলো ক্রমশ। কৈ, এই তো এতকাল কেটে গেল, মিথ্যাপুরের উন্নতিই তো হচ্ছে, অবনতি তো হয়নি!

কিন্তু সে উন্নতিতে যে অন্য-দেশের চোখ টাটাচ্ছিল তা এতদিন ওরা বুঝতে পারেনি। বিশেষত, পাশেই ভারতবর্ষ।

মিথ্যাপুরের জন্য তাদের মাল বিক্রি হয় না বাজারে। ছুনিয়ার বাজারে মিথ্যাপুরের মালেরই আদর, তা সস্তা অথচ টেকসই। তারপর ওরা এত অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চয় করেছে, সে-ও একটা ভয়ের কথা। শুধু ভারতবর্ষই নয়—অন্যান্য দেশেরও টনক নড়লো। সবাই নানারকম ভয় দেখাতে লাগলো। বললে, 'যদি বাইরে মাল পাঠানো বন্ধ না করো তো দেখে নেবো!' অথচ মাল না পাঠালেই বা চলে কিসে, এত মাল কিনবে কে? কলগুলো এখন বন্ধ করে দিলে এতগুলো লোক বেকার হয়ে পড়ে। সে ভারি গণ্ডগোল বেধে উঠবে। ওধারে আরও অন্য যেসব দেশের মাল বিক্রি হচ্ছে না, তারা চাইছে গায়ের জোরে ভিন্‌দেশের বাজারে মাল বেচতে। আবার বুঝি একটা প্রচণ্ড যুদ্ধ বেধে ওঠে! এই কারণেই তো এর আগের ছুটো বড় যুদ্ধ বেধেছে।

এধারে দেশের মধ্যেও গণ্ডগোলের শেষ নেই। কলকারখানায় যারা কাজ করে তারা ভাবে, আমরাই সব করছি, মালিকেরা ফাঁকি দিয়ে বসে খাচ্ছে। আবার মালিকরা ভাবে, সব টাকাই তো ওরা নিচ্ছে, আমরা ব্যবসা চালাচ্ছি কি জন্যে, আমাদের লাভ কি? শ্রমিকদের আরও বেশি তার চেয়েও বেশি টাকা দিতে দিতে লাভ একসময় শূন্য হয়ে আসে—তবু তারা খুশি হয় না। টাকার লোভ বেড়েই যায়। তখন স্থির হলো, লাভের অংশ দেওয়া হোক শ্রমিকদের মধ্যেই ভাগ করে; কিন্তু তাতেও ওরা সন্দেহ করে যে, এর ভেতরে কর্তাদের কোন জোচ্চুরি আছে। গণ্ডগোল বাধাবার লোকেরও তো অভাব নেই। একদল শ্রমিকদের তাতায়, আর একদল মালিকদের। যে সব

বিদেশী লোকদের এদেশে গোলমাল বাধালে স্থবিধা হয়, তারা চেষ্টা করে গোপনে পয়সা দিয়ে এইসব হাঙ্গামা পাকিয়ে তুল্‌তে।

তখন ঘর ও বাইরের এইসব গণ্ডগোল থামাবার জন্য সৈন্যদল বাড়াতে হয়—অস্ত্রের পর অস্ত্র তৈরী করতে হয়। ওসবে যা খরচা হয় তাতে কোষাগার খালি হয়ে দেনা বেড়ে যায়, তবু এমন-কিছুই করা যায় না। অন্য দেশের তুলনায় তা খুবই নগণ্য। অথচ, এটা সবাইকে মানতে হলো, এই টাকাটার দশভাগের একভাগ খরচ করলেই দেশের অনেক উন্নতি করা যেত, প্রজারা এর চেয়ে ঢের বেশী সুখে থাকতো।

ফলে এইবার কর্তারা পড়লেন এক ফ্যাসাদে। কী করা যায়, কী করা যায়—যখন ভাবছেন, তখন সত্যদাসেরই এক দরিদ্র শিষ্য, যাকে এতকাল কেউ লক্ষ্যও করেনি—তার কথা শোনা তো দূরে থাক্—অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে এগিয়ে এসে কর্তাদের জানালে যে, সত্যদাসের পুঁথিপত্রগুলো একবার পড়ে দেখলে বোধহয় একটা হদিস মিলতে পারে। শিষ্যটি তখন নিতান্ত বৃদ্ধ, তাকে পাগল বলেই ভ্রম হবার কথা, তবুও অনেকের মনে পড়ে গেল, তাইতো বুড়ো সত্যদাস সত্যই তো এই ধরণের কথাই সব কী কী লিখে গেছেন!

তখন খোঁজ, খোঁজ,—কোন্ ধূলোর গাদা থেকে দু-একখানা ছেঁড়া-খোঁড়া পুঁথি উদ্ধার করা হলো। দেখা গেল, এমনটা যে হবে তা তিনি অতদিন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, এবং ওদের সাবধান করবারও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কেউই কান দেয়নি তাঁর কথাতে। পৃথিবীর বড় বড় বক্তৃতা ও ঝুটো সমস্যার মধ্যে,

তাঁর সেই সাদাসিধে সরল সত্যি কথাগুলোকে সেদিন প্রলাপ বলেই বোধ হয়েছিল।

এখনও অনেকে বিশ্বাস করতে রাজী হলেন না যে, এত সহজে এতবড় সমস্যার মীমাংসা হওয়া সম্ভব। অথচ আর কোনও উপায়ও ছিল না। অগত্যা এই উপায়ই মেনে নিতে হলো।

'ভাঙ্গ কলকারখানা, ভেঙ্গে ফেল শহরের বড় বড় বাড়ীগুলো। অস্ত্রশস্ত্র সব নদীর জলে ভাসিয়ে দে! ফিরে যা গ্রামে।' এই রব উঠল চারিদিকে।

আর সত্যদাস যা সবচেয়ে জোর দিয়ে বলে গিয়েছেন— 'উঠিয়ে দে, সবার আগে ঐ টঁ্যাকশালটা! যাতে অবিরাম টাকা তৈরী হচ্ছে, নোট ছাপা হচ্ছে। ঐটেই হলো যত গণ্ডগোলের মূল।'

কিন্তু এইবার সত্যিই শান্তি ফিরে এলো সবাই নিজের খাবার নিজে করে নেয়, চরকায় নিজের কাপড়ের সুতো কাটে। মুচি—জুতো দিয়ে তার বদলে নেয় ধান, তেল, নুন, কাপড়। বাজনাদাররা বাজনার বদলে পায় খাবার, মালীরা ফুল দিয়ে কাপড় নিয়ে যায়, টাকার দরকার কি? প্রয়োজন কম, অভাব-বোধও কম। শান্তি ফিরে এল বলেই সুখও দেখা দিলে। আর তুচ্ছ কারণে বিবাদ হয় না—টাকা নেই বলে মনোমালিন্যও নেই। ওরা আর কারুর প্রতিযোগী নয় দেখে, বিদেশীরা নিশ্চিন্ত হলো। এদেশ জয় করেও কোনো লাভ নেই বলে সে চেষ্টা কেউ করে না। কারণ, টাকা নেই, মাল নেই—কী নেবে। ওরা দিন খাটে, দিন খায়। সবাই শ্রম করে—কেউ বসে খাবার চেষ্টা করে না বলে

সবাইকারই স্বাস্থ্য ভালো হয়ে ওঠে, কার মনে কোন অসন্তোষও থাকে না।

এদের এই শান্তি আর সুখ দেখে পৃথিবীর লোক অবাক হয়ে যায়। বলে, কেমন করে এ হলো?

যারা নিজেদের সুবিধার জন্য সত্যদাসকে মেরেছিল, তারাও মাথায় হাত দিয়ে ভাবে, এ কী হলো?

মিথ্যাপুরের লোকেরা দেখিয়ে দেয় সত্যদাসের পুঁথি। বলে, 'তিনি তো মরেন নি! তিনি আবার আমাদের বাঁচাবার জন্য জন্ম নিয়েছেন। তাঁর বাণী এবং তাঁর জীবনের আদর্শের মধ্যে তিনি বেঁচে উঠেছেন আবার! যা সত্যি তার যে মরণ নেই!'

আর ডাক দিয়ে বলে ওদের, যাদের মধ্যে ঝগড়া আর অশান্তি জমে উঠেছে পাহাড়ের মত,—'ওরে তোরা আয়, শান্তি চাস্ তো আয়। অমন করে মরিস্‌নি, এখনও বাঁচবার পথ খোলা আছে!'

রাজ-শক্তি বজ্র-সুকঠিন

'আবার বিদ্রোহ?'

মহারাজাধিরাজ বিন্দুসারের মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল বিরক্তিতে। 'তক্ষশীলার অধিবাসীরা আবার বিদ্রোহ করেছে? কী ভেবেছে ওরা? ওরা কি মনে করেছে যে মৌর্যদের রাজশক্তি আজ মরে গেছে, না কি তাদের শৌর্য শুধু কাহিনীতে পরিণত হয়েছে?'

যে দূত এসেছিল তক্ষশীলা থেকে, সে অপরাধীর মত মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

অমাত্যরা বসেছিলেন সম্রাটের ডান দিকে, রাজকুমাররা ছিলেন বাঁ-দিকে। তাঁদেরই মধ্য থেকে কে একজন বিনীতভাবে প্রশ্ন করলেন মহারাজকে, 'বিদ্রোহের কারণটা আগে জানলে হত না—রাজাধিরাজ?'

সম্রাট আরও বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কারণ আবার কি? স্পর্ধা! ভেবেছে, সুদূর পাটলিপুত্র থেকে মৌর্য-সম্রাটের রাজশক্তি তক্ষশীলাকে শাসন করতে পারবে না। তাদের জানিয়ে দেব যে, আকাশের বজ্র আরও দূর থেকে আসে, তবু তা কম শক্তিশালী নয়। মগধের রাজশক্তি সেই বজ্রের মতই, তেমনই শক্তিশালী!'

যে রাজকুমার প্রশ্ন করেছিলেন তিনি কিন্তু তাতেও থামলেন না। বরং খুব মৃদুকণ্ঠে হলেও বেশ স্পষ্টভাবেই আবার বললেন,
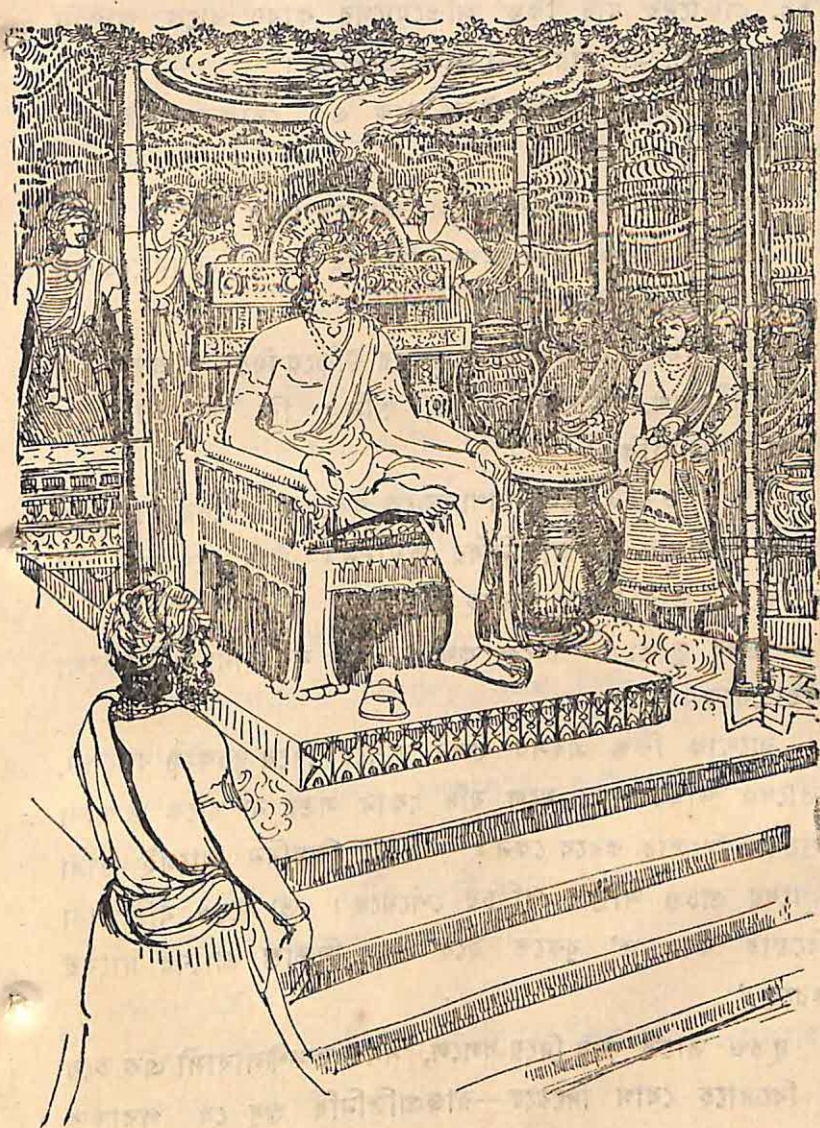
'তবু, প্রজাদের যদি কিছু অভিযোগের কারণ থাকে, আপনি তাদের পিতা, আপনার সেটা জানা প্রয়োজন!'

রাজসভায় মৃদু গুঞ্জন উঠল, 'কে ও! ছোকরার ধৃষ্টতা ত' কম নয়!'

কে একজন যেন কাকে বললে, 'অশোক বোধ হয়।'

'ও, তা না হলে আর অমন বুদ্ধি কার হবে? যেমন চেহারা, তেমনি হোঁৎকা বুদ্ধি!'

কিন্তু বিন্দুসার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। বললেন, 'বেশ, অভিযোগটা কি, শুনি? কি হে, অভিযোগ কিছু আছে নাকি?'

দূত ঘাড় হেঁট করেই মাথা চুলকে বললেন, 'তাদের অভিযোগ হচ্ছে আপনার রাজপ্রতিনিধির কুশাসন। তাঁর যথেচ্ছাচারিতা নাকি আর তারা সইতে পারছে না।'

'ওসব ছুতো।'...'বাজে কথা।' এই সব নানা ধ্বনি উঠলো সভা থেকে।

অশোক কিন্তু এইসব গুঞ্জন ডুবিয়ে দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'তাদের অভিযোগের মূলে যদি কোন সত্য না থাকে ত তারা বারবার বিদ্রোহ করবে কেন? এইতো কিছুদিন আগেই তারা মগধের প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় পেয়েছে। তা সত্ত্বেও, যদি তারা বিদ্রোহ করে ত' বুঝতে হবে যে, নিতান্ত প্রাণের দায়েই করছে।'

দূতও তাতে সায় দিয়ে বললে, 'সমস্ত তক্ষশীলাবাসী এক হয়ে এ বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে—রাজপ্রতিনিধি শুধু যে পরাভূত

তাই নন—তিনি বিদ্রোহীদের হাতে বন্দী। তারা বলছে যে, সমগ্র তক্ষশীলা যদি এ বিরোধে ধ্বংস হয়ে যায় তাও ভালো, তবু এ অনাচার তারা সইবে না।'

'আচ্ছা, দেখা যাক!' ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠেন বিন্দুসার, 'সমস্ত তক্ষশীলা ধ্বংস করেই তাদের এ স্পর্ধার উত্তর দেব। রাজ-প্রতিনিধির শাসন যদি কুশাসন হয় ত' তার বিচার করবার জন্য আমি আছি, সে বিচার তাদের নিজের হাতে তুলে নেবার কোন অধিকার নেই।'

এই বলে তিনি একটু থেমে বললেন, 'তক্ষশীলায় বিদ্রোহদমনের ভার এবার আমি কোন রাজকুমারকে দিতে চাই। কে যাবে তোমাদের মধ্য থেকে?'

সুসীম বললেন, 'আমি যাবো।'

অশোক বললেন, 'আমি যাবো।'

বীগতশোকও সেই প্রার্থনা জানালেন।

বিন্দুসার পড়লেন বিপদে। তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা কে কত সৈন্য চাও?'

বীগতশোক চাইলেন দশহাজার, সুসীম চাইলেন পাঁচ হাজার।

অশোক বললেন, 'আমি একাই যাবো সম্রাট?'

সম্রাট বিস্মিত হয়ে বললেন, 'একা?'

'হ্যাঁ—একা।'

'মনে রেখো, তক্ষশীলার নাগরিকরা শিশু নয়—এ ব্যাপারটা ঠিক ছেলেখেলাও নয়।'

'তা জানি। তবু একাই যাবো।'

বিন্দুসার একটু ভেবে বললেন, 'একা যাওয়া অসম্ভব। দীর্ঘ পথ···বেশ, তুমি একশত জন দেহরক্ষী নিয়ে যাও।'

অমাত্যরা বললেন, 'কিন্তু এ যে বাতুলতা। এতে বিদ্রোহ-দমনের কাজে অনর্থক বিলম্ব হবে।'

অশোক সকলের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'যদি বিদ্রোহ দমন করতে না পারি, আর পাটলিপুত্রে ফিরব না—এই প্রতিজ্ঞা রইল।'

বিন্দুসার মনে-মনে বীরপুত্রকে আশীর্বাদ করে অমাত্যদের বললেন, 'দেখাই যাক্ না—আমার পিতৃদেব একার চেষ্টাতেই এতবড় সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, ও তাঁরই পৌত্র।'

তক্ষশীলায় ইতিপূর্বেই সংবাদ এসে গিয়েছে, রাজকুমার অশোক আসছেন বিদ্রোহদমনে।

তক্ষশীলার নাগরিকরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তবু উৎকণ্ঠা একটু আছে বৈ কি! না জানি, তিনি কত বীর, কত লোক তাঁর সঙ্গে আছে তাই বা কে জানে!

সাবধানে তাঁরা প্রস্তুত হতে লাগলেন, নগর-তোরণ রক্ষার ভার দেওয়া হ'ল বাছাই-করা বীরদের হাতে। নগরপ্রাচীর পাহারা দিতে লাগলেন সকলে সারারাত জেগে।

অবশেষে সংবাদ এলো, অশোক এসে পড়েছেন।

কিন্তু কৈ? পাটলিপুত্রের বিপুল এবং অপরাজেয় বাহিনী কৈ?

অশোক আর তাঁর মুষ্টিমেয় দেহরক্ষী! তবে বুঝি সৈন্যদল আরও পিছনে আছে ?

না, ঐ যে! সে-দেহরক্ষীদেরও দূরে রেখে অশোক ঘোড়া ছুটিয়ে একা এগিয়ে এলেন! কোমরে তরবারি আছে বটে, তবে সে কোষবদ্ধ, হাত একেবারে নিরস্ত্র।

তক্ষশীলাবাসীরা অবাক। তাদেরও হাত-পা-চলছে না। ছবিতে আঁকা জনতার মতই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা।

অশোক একেবারে সামনে এসে প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা আমাকে বধ করতে চাও ? করো—আমি ত' নিরস্ত্র।'

প্রজারা তবু নির্বাক্।

অশোক ঘোড়া থেকে নেমে এসে বললেন, 'এত যুদ্ধসজ্জা কার জন্য ভাই ? আমরা কি তোমাদের পর ? তোমরা আমার বাবার প্রজা, তাঁর সন্তান—আমার ভাই। ভাইকে অভ্যর্থনা করার ত' এ রীতি নয়!'

কে দু-একজন পিছন থেকে কটূক্তি করে উঠল বটে, তবে তাদের কণ্ঠ ডুবিয়ে দিয়ে বিপুল জয়ধ্বনি উঠল, 'জয় কুমার অশোকের জয়!'

'ছি-ছি-ভাই, মহারাজ বিন্দুসারের জয়ধ্বনি আগে, তিনি আমাদের পিতা।'

'কিন্তু তিনি আমাদের দুঃখ-কষ্টে কান দেন না—তাঁর প্রতিনিধির কুশাসনে আমরা জর্জরিত। কিসের পিতা তিনি, সন্তানের বেদনা যদি না বোঝেন ?'—একজন নাগরিক বলে উঠলেন।

অশোক বললেন, 'তিনি দূরে আছেন, কিন্তু তোমাদের অভিযোগ শুনলে তিনি প্রতিকার করতেন না—এ কখনও হয় ? রাজপ্রতিনিধির শাসন তোমাদের ভাল লাগেনি, সেকথা তাঁকে জানাওনি কেন ? তোমার ভাই তোমার ওপর অত্যাচার করলে আগে বাবাকে জানাবে, না, বাবার ওপর একেবারে বিদ্রোহী হয়ে বসবে ? এ তোমাদের কেমন ভুল বোঝা ভাই ?'

নাগরিকরা জবাব দিলেন—'সেইজন্যই দূরের শাসন আমরা চাই না। আমাদের শাসন আমরাই করব। আমাদের অভিযোগ যখন অতদূরে পৌঁছয় না—'

'কে বললে পৌঁছয় না ? অভিযোগ ত' করোনি তোমরা, করলে পৌঁছত ঠিকই। সংবাদ পৌঁচেছে মাত্র ; তারই অভিযোগ শোনবার জন্য রাজাধিরাজ আমাকে পাঠিয়েছেন।'

'আপনি এসেছেন বিদ্রোহ দমনে !' উত্তর এলো ভীড়ের মধ্য থেকে।

অশোক বললেন, 'কৈ, তা'হলে ত' অস্ত্র থাকত, লোক থাকত। আমি তোমাদের রাজপুত্র, তোমাদের অতিথি হয়ে এসেছি। তোমাদের কথা শুনতে এসেছি।'

তারপর সবাইয়ের দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন, 'রাজপ্রতিনিধি ত' কর্মচারী মাত্র। তাঁর শাসন ভাল না হয়, তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হবে, তাতে কি ? তার জন্য এত কেন ?'

একটি তরুণ বললে, 'আমাদের রাজপ্রতিনিধি তাহ'লে আমাদের বেছে নিতে দিন।'

'বেশ ত। নাও না। এ ত সামান্য কথা।'

'কথা দিচ্ছেন ?'

'দিচ্ছি।'

'বেশ, তাহ'লে আপনিই রাজপ্রতিনিধি হয়ে আমাদের শাসন করুন!'

কুমার অশোক বিব্রত বোধ করলেন, কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্য। তারপরই হেসে বললেন, 'এইবার তোমাদের কাছেই আমাকে হার মান্‌তে হ'ল। বেশ, তাই হোক্।'

সঙ্গে সঙ্গে জনতা বিপুল হর্ষধ্বনি করে উঠল, 'জয় কুমার অশোকের জয়।'

অশোক বললেন, 'তাহলে আর বিদ্রোহের প্রয়োজন আছে কি ? এখনও কি আপনারা রাজা বদ্‌লাতে চান ?'

আবারও বিপুল জয়ধ্বনি করে উঠল সবাই, 'জয় সম্রাট বিন্দুসারের জয়!'

অশোক তখন তার সঙ্গী একজন দূতকে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে বললেন, 'তুমি সম্রাটকে খবর দাওগে যে, তক্ষশীলার বিদ্রোহ দমন হয়েছে, মগধের বজ্র-কঠিন রাজশক্তির পরিচয় এঁরা পেয়েছেন। সম্রাটের জয়ধ্বনি ত' তুমি নিজেই শুনে গেলে। সম্রাটকে আমার এবং তক্ষশীলাবাসীর প্রণাম নিবেদন ক'রো।

আবারও সেই তক্ষশীলার নাগরিকদের বিরাট জনতা জয়ধ্বনি করে উঠল, 'জয়, সম্রাট বিন্দুসারের জয়!...জয়, কুমার অশোকের জয়!'

সূত্রপাত

সমস্ত সভা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল—কোথাও কারও মুখে কোন সাড়া নেই!

তারপর রাজা অম্ভীই সে জড়তা ভঙ্গ করে প্রশ্ন করলেন, 'উত্তর-পশ্চিমের হিংস্র দুর্ধর্ষ পার্বত্য জাতিরাও হার মেনেছে গ্রীক যবনদের কাছে? কী বলছ বসুসেন, এ যে একেবারেই অবিশ্বাস্য!'

গুপ্তচর বসুসেন যবনদের সংবাদ সংগ্রহ করতেই গিয়েছিল। সে মাথা হেঁট করে বললে, 'মহারাজের সামনে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করব এমন ধৃষ্টতা আমার নেই। সমগ্র পুষ্কলাবতী মাত্র এক মাসের মধ্যে ওদের পদানত হয়েছে, উরসা ও অভিসারের দিকে ওদের সৈন্যবাহিনীর মুখ ঘুরেছে দেখে আমি ফিরে এসেছি সংবাদ দিতে।'

'পুষ্কলাবতীর সংবাদ আমি আগেই পেয়েছি বসুসেন, কিন্তু আমি ভাবছি গান্ধার, মাসাগা—এদের কথা। এরাও হার মান্‌লে? এদের ওপরই ভরসা যে আমাদের সব চেয়ে বেশী ছিল।'

'ওরা যতই হিংস্র হোক—যবনদের যুদ্ধ-কৌশল ও নিয়মানুবর্তিতার কাছে ওদের সমস্ত পরাক্রম হার মানতে বাধ্য হ'ল।'

প্রধান সেনাপতির ভ্রূ বিরক্তিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠল, তিনি একবার তাঁর তরবারিতে হাত দিলেন। অর্থসচিব কিন্তু সেদিকে

চেয়ে পরিহাসের সুরে বললেন, 'অত ক্রুদ্ধ না হলেও চলবে সেনাপতি! যারা এত বড় বড় বীর জাতিদের পরাজিত করে অসংখ্য দেশ দখল করলে, তাদের রণকৌশলের মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু আছে বৈকি! কিন্তু আমি ভাবছি মহারাজ, পুষ্কলাবতী থেকে সোজা নদী পেরিয়ে আমাদের দেশে এসে না পড়ে উরসার দিকে যাবার অর্থ কি?'

প্রধান মন্ত্রী বজ্রভূতি উত্তর দিলেন, 'এর অর্থ খুব সহজ। আমাদের সামনে দিয়ে এত বড় নদী পেরোবার চেষ্টা করলে কিছু নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দেওয়া হ'ত বৈ কি! তার চেয়ে উরসা ও অভিসার যদি ওদের পদানত হয় তাহলে আমাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ধরা কি ঢের সহজ হবে না? তা ছাড়া তক্ষশীলার নাম ডাক আছে ত!'

অর্থসচিব বললেন, 'তা আছে, তেমনি গান্ধার থেকে মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত রাজপথও পড়ে আছে আমাদেরই সামনে দিয়ে। এ ছেড়ে পাহাড়ের পথে অভিসার যাওয়াটা তাদের দুঃসাহসেরই পরিচয়।'

অম্ভী আবার কথা কইলেন, 'তাহলে এখন উপায়? উরসা হয়ে তারা ফিরে যাবে এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। তক্ষশীলার বিপুল ঐশ্বর্যের খ্যাতি তাদের অজানা নয়।'

বজ্রভূতি বললেন, 'উপায় আর কি! যুদ্ধ করা। পরাজয়ের সম্ভাবনা হয়ত আছে, তা বলে এই সুপ্রাচীন দেশের মর্যাদা বিনাযুদ্ধে যবনদের পায়ের কাছে রাখতে পারি না!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অম্ভী বললেন, 'যুদ্ধ মানে ধ্বংস। এই সুন্দরী তক্ষশীলার চিহ্নও থাকবে না বজ্রভূতি!'

'কী আর করা যাবে মহারাজ? স্বাধীনতাই যদি গেল ত তক্ষশীলাও না হয় যাক্! ওর মূল্য কি?'

'তাই হোক্। সেনাপতি, তক্ষশীলার সমস্ত সৈন্যশক্তি একত্রিত করুন—চেষ্টার কোন ত্রুটি না হয়!'

অম্ভী সভা থেকে বেরিয়ে বিশ্রাম করতে যাবার পথে একটি অলিন্দের ধারে এসে থমকে দাঁড়ালেন। সুউচ্চ অলিন্দ থেকে, তক্ষশীলার অনেকখানিই দেখা যায়। সুন্দর নগরী—এত সুন্দর শহর বোধ হয় সমগ্র ভারতবর্ষে আর নেই। অশিক্ষিত বর্বর গ্রীক যবনদের হাতে পড়লে এর কি আর কোন চিহ্ন থাক্‌বে? অম্ভী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর সাধের তক্ষশীলা। পূর্বপুরুষরা পুরুষ-পরম্পরায় যে বিপুল ঐশ্বর্য, যে শিল্পসম্ভার এখানে জড়ো করেছেন, আগামী কালের নাগরিকরা তার চিহ্নমাত্র পাবে না—হয়ত এর কথাও শুনতে পাবে না! আজ তক্ষশীলা সমগ্র ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র, দেশদেশান্তর থেকে দু তিন বৎসরের পথ অতিক্রম করে ছাত্ররা আসে পড়তে। এইখানেই ভারতের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ রসায়নশালা ও গবেষণাগার। এইখানেই আধুনিক আয়ুর্বেদ-সম্মত প্রথম চিকিৎসালয়—এইখানেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পভবন ও শিল্পশিক্ষালয়। এসব নষ্ট হয়ে যাবে? এটা তিনি জোর করে বলতে পারেন যে এত বেশী শিল্পসম্ভার পৃথিবীতে কোথাও নেই—আর সব ঐশ্বর্যই একদিন মানুষ ফিরে পেতে পারে কিন্তু এসব জিনিষ নষ্ট হলে একেবারেই গেল। অথচ, যুদ্ধ বাধলে এর কিছু কি আর চিহ্ন থাকবে?

অন্তীর চোখে জল এসে গেল। তিনি উত্তরীয়ে জল মুছে অন্তঃপুরের দিকে পা বাড়ালেন।

এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল, বহুদূরে প্রাসাদ-তোরণে অগ্নিশিখার মত এক দীর্ঘাকৃতি নগ্নপদ ব্রাহ্মণের সঙ্গে প্রহরীদের কী বচসা হচ্ছে! তিনি তখনই একজন প্রহরী পাঠালেন খবর নিতে। সে ফিরে এসে খবর দিলে ঐ ব্রাহ্মণ এখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়, প্রহরীদের কোন নিষেধ মানছে না, ব্রহ্মশাপের ভয় দেখাচ্ছে।

অন্তী বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তা তাঁকে বাধা দিচ্চ কেন?'

'বিশ্রামের সময়—?'

'বিশ্রাম আবার কি? নিয়ে এস ওঁকে। নিশ্চয়ই কোন জরুরী প্রয়োজন আছে, তাই উনি অমন করছেন।'

একটু পরেই ব্রাহ্মণ এলেন। দীর্ঘকায়, বরং কিছু শীর্ণ। গৌরবর্ণ, তেজস্বী মুখভাব—দৃষ্টি উজ্জ্বল। ব্রাহ্মণ বোধহয় দৌড়েই এসেছেন, কারণ তখনও হাঁপাচ্ছেন, 'মহারাজ, আপনি নাকি যবনদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন?'

বিস্মিত অন্তী বললেন, 'হ্যাঁ—তাতে কী হয়েছে?'

'মহারাজ, আপনি কি উন্মাদ?'

ওর ধৃষ্টতা দেখে অন্তী স্তম্ভিত। তিনি বললেন, 'রাজসভাতে এসব মন্ত্রণা হয়ে গেছে, আর কোন বক্তব্য থাকে বলুন!'

'না মহারাজ আমার কথা শুনতে হবে। এতগুলো দেশ ও এত বড়-বড় জাতি যাকে হারাতে পারলে না, তাকে হারাবার স্বপ্ন দেখবেন না। আমি রাজসভার বাইরের লোক মারফৎ

খবর পেয়েছি, পুষ্কলাবতী, গান্ধার, উরসা—সব আজ তার তার পদানত। তক্ষশীলা, তার এই বিপুল ঐশ্বর্য এবং জ্ঞানের ভাণ্ডার নিয়ে একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে? আমি জানি—আপনিও তা চান না, সুতরাং এ আত্মঘাতী যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হ'ন। সম্মুখ যুদ্ধে এদের সঙ্গে পারবেন না।'

'তবে? আপনি কি বলেন? যবনের পদ-লেহন করতে?' বিদ্রূপের সুরে প্রশ্ন করেন অম্ভী।

'কৌশল অবলম্বন করুন মহারাজ, কোন একটা-রাজ্যের সৈন্যবাহিনী ওদের সঙ্গে পেরে উঠবে না। ওরা যুদ্ধবিদ্যা জানে, কৌশলে অদ্বিতীয়, তার ওপর এত দিনের অভিজ্ঞতায় অপরাজেয়। তাদের সঙ্গে আপনাদের মত এই সব ছোট ছোট দেশ কী যুদ্ধ করবে? অসুররাই পারলে না। আমি যা বলি শুনুন, এখনই দূত পাঠান যবনরাজ সেকেন্দারের কাছে, তাঁকে উপহার দিয়ে বিনয় বচনে নিমন্ত্রণ করে আসুক তক্ষশীলায়। আর এধারে সামান্য সৈন্য আপনার রাজধানীতে রেখে বাকী সৈন্য পাঠিয়ে দিন গোপনে বিতস্তা পেরিয়ে পুরুরাজের কাছে। আপনার সৈন্য, বৃদ্ধ পুরুরাজের সৈন্য এবং যদি তাঁর সঙ্গে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তরুণ পুরুরাজের একটা আপোষ হয়ে চন্দ্রভাগার পূর্বপার থেকে কিছু সৈন্য আসে ত কথাই নেই। যুদ্ধটা ওখানেই হোক্, এই মিলিত বাহিনীর হাতে যবনদের পরাজয়ের সম্ভাবনা তবু আছে, আর তা যদি নাও হয়, তবে তক্ষশীলা ত বাঁচবে! তখন এটাও সান্ত্বনা থাকবে যে মিলিত বাহিনী যাকে হারাতে পারল না, আপনার একক বাহিনী তা পারত না!'

অম্ভী স্তম্ভিত হয়ে ব্রাহ্মণের কথাগুলো শুনলেন। ওঁর মনে হ'ল যে স্বয়ং ভগবান একে পাঠিয়েছেন তক্ষশীলাকে বাঁচাবার জন্য, নইলে তাঁর মনের কথা ইনি জানবেন কি করে ?

অম্ভী সব ভুলে ওঁর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললেন মন্ত্রণাসভার দিকে। এখনও সময় আছে, মন্ত্রীরা হয়ত সবাই চলে যাননি।

সেই ব্রাহ্মণই অম্ভীর চিঠি নিয়ে গেলেন বিতস্তা পেরিয়ে পৌরবদের দেশে, বৃদ্ধ পুরুরাজের সভায়।

চিঠি পড়ে পুরুরাজের মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল। বললেন, 'শোন হে, কাপুরুষ অম্ভী ভয় পেয়ে গেছে, সে যবনদের সঙ্গে সন্ধি করেছে। আবার তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাকে লিখে পাঠিয়েছে যে, আমি যদি যুদ্ধ করি ত গোপনে সে আমাকে তার সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে রাজী আছে! ছোঃ!'

সমস্ত সভাতে একটা বিদ্রূপের গুঞ্জন উঠল। তারপর খুব একচোট হেসে নিয়ে পুরুরাজ বললেন, 'অম্ভীটাকে গিয়ে বলো যে আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতই আছি—তবে তার কোন সাহায্য চাইনা। সে ভীরু যেন তার এবং তার দেশবাসীর প্রাণ নিয়ে লুকিয়ে বসে থাকে। যবনরা এখনও পৌরবদের শৌর্যের পরিচয় পায়নি—এইখানেই তাদের পরাজয় ঘটবে।'

ব্রাহ্মণ বিরক্ত হলেও চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার বললেন, 'এই যারা একের পর একে ওদের পদানত হচ্ছে, তারা সকলেই কি অমানুষ, শুধু পৌরবরাই বীর ?'

'দেখা যাক্ না—ফলেই টের পাবে।' মুচকে হাসলেন পুরুরাজ।

'তা হয় না মহারাজ', দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন ব্রাহ্মণ, 'গান্ধার, পুষ্কলাবতী, উরসা—এরা কেউ পৌরবদের চেয়ে কম বীর নয়। শুধু আপনার সৈন্যরা কিছুতেই পারবে না। তক্ষশীলার সঙ্গে মিলিত হতে যদি আপনার আপত্তি থাকে তাহলে এখনও সময় আছে মহারাজ, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে নিন—চলে যান অভিসারের দিকে। তাদের সাহায্য করুন—সেইখানে যুদ্ধরত যবনদের অতর্কিতে আক্রমণ করুন, শত্রু ঐখানেই পরাস্ত হোক্।'

রাগে পুরুরাজের মুখ লাল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'একে তুমি দূত তায় ব্রাহ্মণ, তাই বেঁচে গেলে এযাত্রা। তোমার এত স্পর্ধা—আমাকে বুদ্ধি দিতে এস! কারুর সাহায্য লাগবে না—পৌরবরাই যবন-বিজয়ের গৌরব লাভ করবে। আমার ভাইপোকেও প্রয়োজন নেই। আমি একাই যথেষ্ট। আমি যাবো অভিসার রাজ্যকে সাহায্য করতে? প্রতিবেশী শত্রুকে প্রবল করে তুল্‌ব? তার চেয়ে এই ভাল, ওরাও ধ্বংস পেলে, ইতিমধ্যে যবনদেরও কিছু বলক্ষয় হ'ল—আমাদের পক্ষে যবনদের হারানো সহজ হবে। তুমি ফিরে যাও ব্রাহ্মণ, অম্ভীকে গিয়ে বলো আমি তার প্রস্তাব ঘৃণাভরে উপেক্ষা করেছি!'

ব্রাহ্মণ অস্ফুটকণ্ঠে শুধু বললেন, 'ফণী যার দংশে শিরে, কি করে ঔষধে!......মৃত্যু আসন্ন হ'লে এমনি দুর্বুদ্ধিই হয়। তবু একটা শেষ সৎপরামর্শ দিই মহারাজ! যদি একান্তই যুদ্ধ করবার সাধ হয়ে থাকে তাহলে এখনই আপনাদের তিনচারজন সেনানীকে

পাঠিয়ে দিন উত্তর দেশে, যেখানে তারা যুদ্ধ করছে, ছদ্মবেশে গিয়ে গোপনে তাদের সমরকৌশল দেখে আসুক—সেই-মত প্রস্তুত হোক্। আর একটি কাজ করবেন, হাতী নিয়ে যাবেন না, ওরা কাজ যত করে তার চেয়ে বেশী করে অকাজ।'

পুরুরাজ রাগের চোটে উঠে দাঁড়ালেন, 'ব্রাহ্মণ, এই মুহূর্তে রাজসভা এবং আমাদের দেশ যদি ত্যাগ না করো ত জীবনটি রেখে যেতে হবে এখানে স্মরণ রেখো। তোমার এত স্পর্ধা— বলো পৌরবরা যাবে যবনদের কাছে যুদ্ধবিদ্যা শিখতে? যাও, দূর হও, ধৃষ্ট মূর্খ ব্রাহ্মণ!'

একটুখানি ম্লান হেসে ব্রাহ্মণ রাজসভা থেকে বেরিয়ে এলেন। আপন মনেই বলতে বলতে এলেন, 'হারে দেশ, কোথাও কোন আশা নেই তোর, শুধু আত্মশ্লাঘাতেই তোর মৃত্যু হবে।'

সিংহদ্বারের বাইরে পা দিয়েছেন এমন সময় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের এক তরুণ যুবক এসে ওঁকে প্রণাম করলে।

ব্রাহ্মণ একবার মাত্র তার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি এই রাজসভারই এক কোণে বসেছিলে না?'

'ঠিকই লক্ষ্য করেছেন ঠাকুর!'

'তুমি মাগধী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এখানে কী করছ?'

যুবক উত্তর দিলে, 'আমি রাজা মহাপদ্মনন্দের পুত্র। আমার এক ভাই এখন রাজা। সে রাজা হবার আগে আমি সেখানকার সমর-সচিব ছিলাম, আজ তার অত্যাচারে একবস্ত্রে বেরিয়ে

আসতে বাধ্য হয়েছি। আমার বেচারী মা এখনও সেখানে বন্দিনী!'

'তা এখানে কেন?'

'এসেছি যদি এখানে কোন সাহায্য পাই বা একটা সৈন্যদল গঠন করতে পারি ত একবার চেষ্টা করব মগধের সিংহাসনের জন্য।'

'হুঁ—তা আমার কাছে এসেছ কেন?'

'দেখলাম আপনার সৎপরামর্শ শোনবার লোক এখানে নেই—কিন্তু বুঝলাম তার সারবত্তা, তাই আপনার শরণ নিতে এসেছি, আমাকে যদি একটু বুদ্ধি দেন।'

ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ নীরবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার পর বললেন, 'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি সত্যি কথাই বলছ। আমি যা বলব, শুনবে?'

'শুনব।'

'চলে যাও এখনই উত্তর দেশে। সেকেন্দারের কাছে অনুনয় করে তার দাসত্ব করগে।'

'দাসত্ব করব?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অর্বাচীন—দাসত্ব করগে। সারা পৃথিবী যার পদানত হতে চলেছে তার দাসত্ব করায় কিছুমাত্র অগৌরব নেই। সেখান থেকে, তাদের একজন হয়ে শিখে এস কী কৌশলে এতগুলি বীরের জাতকে ওরা হারিয়ে দিলে! যখন বুঝবে ওদের যুদ্ধবিদ্যা সব শেখা হয়ে গেছে, তখন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রো। আমি তক্ষশীলায় অধ্যাপক-পল্লীতে থাকি।'
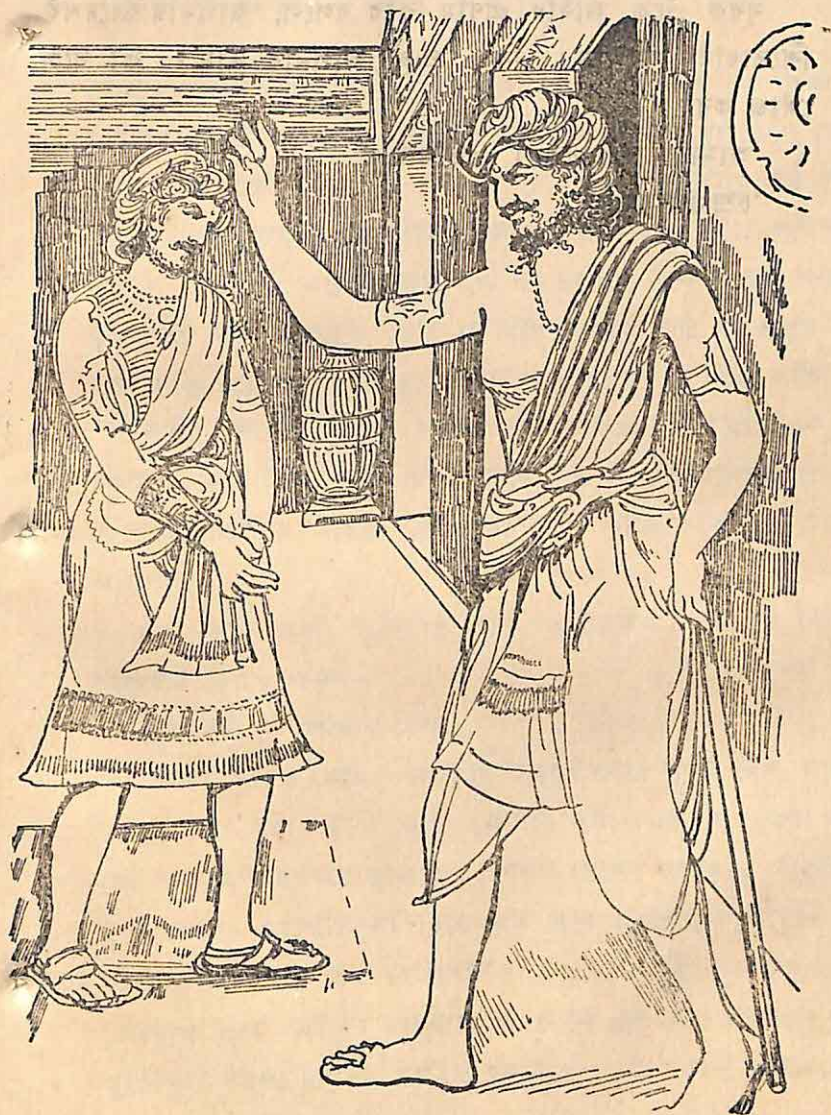
যুবক ওঁকে আবার প্রণাম করে বললে, 'আপনার আদেশই শিরোধার্য করলাম। কিন্তু প্রভু, আপনার নাম? কী বলে খোঁজ করব?'

'আমার নাম চাণক্য। তোমার?'

'চন্দ্রগুপ্ত নন্দ।'

সোনার দেশে লোহার মানুষ

বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর সঙ্গে নারায়ণের সামান্য একটু তর্ক বেধেছিল। নারায়ণ বলছিলেন, 'তোমার পূজো করে সামান্য লোকরা, কৈ তেমন বড় কেউ করেছে বলে ত শুনিনি। পৃথিবীতে যত বড় সাধক, ভক্ত আছে সবাই আমার জন্যই জপ-তপ করে, তপস্যা করে। এমন কি অসুর রাক্ষস যারা বড় হয়েছে, রাবণই বল আর বৃত্রাসুরই বল, তারাও কেউ তোমার পূজো করে বড় হয়নি— ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এঁদের কাছে বর পেয়ে তাদের যা কিছু শক্তি।'

লক্ষ্মী বললেন, 'কেউ হয়নি বলে যে হতে পারে না—এর ত কোন মানে নেই! আমি প্রমাণ করে দেব যে শুধু আমার পূজো করেও পৃথিবীতে মানুষ বৃত্র-বলি-রাবণের মতই শক্তিশালী হতে পারে!'

এই বলে লক্ষ্মী পৃথিবীর দিকে তাকালেন। নীচের দিকে চাইতেই চোখে পড়ল—

সুবর্ণপুরী! সোনার দেশ।

আহা সার্থক নাম! পাহাড় সমুদ্রে ঘেরা সুন্দর দেশ, গাছে তার অমৃত ফল, মাঠে তার সোনার ধান—নদীতে ত জল নয়, যেন ক্ষীরের ধারা বয়ে চলেছে! একই দেশের কোথাও সুমেরুর মত ঠাণ্ডা, কোথাও সাহারার মত উষ্ণ মরুভূমি—কোথাও বা স্বর্গের মত চিরবসন্ত বিরাজমান! কোথাও কোন অভাব নেই, কোথাও দুঃখ নেই! মানুষকে সে দেশে শুধু বেঁচে থাকবার জন্য ছুটোছুটি করতে হয় না, খাটতে হয় না। তারা বেশী চায়ও না।
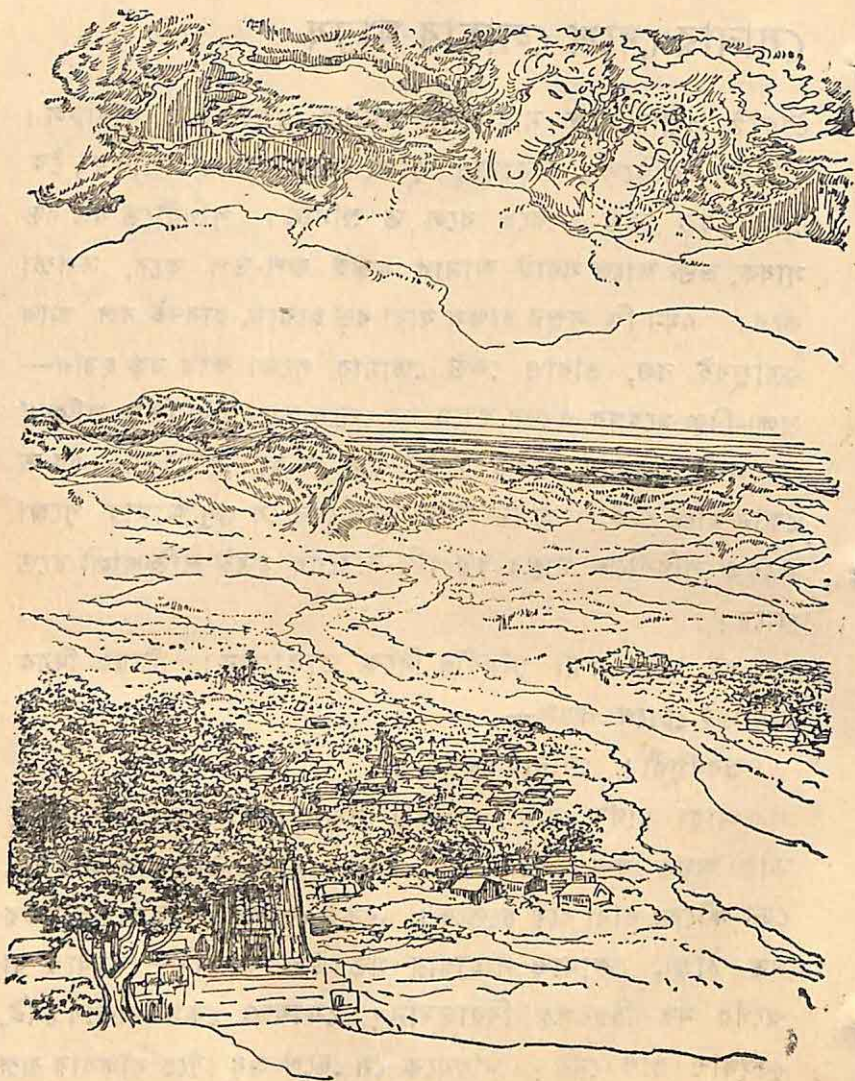
ফুলের গন্ধে, পাখীর ডাকের মধ্যে ছোট ছোট কুটীর বেঁধে লেখাপড়া নিয়ে থাকে। তাদের লোভ নেই, বেশী আশা নেই—যা পেয়েছে তাতেই খুশী। অন্যদেশের ঐশ্বর্য নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না, তাদের দেশে যারা আসে তাদেরই সাদরে ডেকে স্থান দেয়। বড় শান্ত, মধুর তাদের জীবন।

যেমন দেখা অমনি মন স্থির করা। লক্ষ্মী নেমে এলেন সুবর্ণপুরীতে।

প্রথমেই গেলেন রাজার কাছে। বললেন, 'তুমি আমার পূজো কর, তোমাকে আমি আরও দেব। সমস্ত পৃথিবীর রাজা করে দেব তোমাকে।'

রাজা মাথা নেড়ে হাতজোড় করে বললেন, 'দেবি, ভগবান আমাকে যে দেশটুকু দিয়েছেন শাসন করবার জন্য, সেইটিই যেন ভালভাবে শাসন করতে পারি এই আশীর্বাদ করুন। আমি ক্ষত্রিয়, প্রজাপালন করা, দুর্বলকে রক্ষা করা, আর দুষ্টকে শাসন করা এই আমার কাজ। আর কিছু চাই না, লোভও নেই। যদি সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিতে পারি তাহ'লেই আমার ঢের পুরস্কার পাওয়া হবে।'

লক্ষ্মী সেখান থেকে গেলেন প্রজাদের কাছে।

পুরুষরা বললে, 'লোভেতে লোভ বেড়েই যায়—ঐশ্বর্যে মানুষের তৃপ্তি নেই। তোমাকে আমরা চাই না, তুমি চলে যাও।'

মেয়েরা বললে, 'তোমার ও ধনদৌলতে আমাদের কি হবে? রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু—এর হাত থেকে ত তুমি আমাদের বাঁচাতে পারবে না। আমরা চাই অমরত্ব—অর্থ নয়। তুমি যাও।'

রাগে লক্ষ্মী জ্বলে উঠলেন। সেখান থেকে সোজা চলে গেলেন শ্বেতদ্বীপে। সেখানকার রাজাকে বললেন সেই কথাই—যা স্বুবর্ণপুরীর রাজাকে বলেছিলেন।

শ্বেতদ্বীপের রাজা বললেন, 'দেবি, আমার বড় লোভ ঐ স্বুবর্ণপুরীর ওপর—ওটি দিতে পারেন?'

লক্ষ্মী বললেন, 'পারি। সমস্ত পৃথিবীর রাজা করে দেব তোমাকে। স্বুবর্ণপুরীও পাবে তুমি।'

রাজা বললেন, 'কি করে?'

লক্ষ্মী জবাব দিলেন, 'আমার অন্য অস্ত্র নেই। আছে লোভ আর আছে এই—টাকা। এই দিয়েই পৃথিবী জয় করতে পারবে।'

এই বলে তিনি একটি সোনার টাকা রাজার হাতে দিলেন। বললেন, 'টাকা দিলেই সব জিনিষ পাওয়া যায়, এইটে ওদের বুঝিয়ে দাও। ওদের শস্য নিয়ে টাকা দাও, কাপড় নিয়ে টাকা দাও। আর স্বুন্দর স্বুন্দর বিলাসের জিনিষ নিয়ে গিয়ে ওদের সামনে ধরো, টাকা দিলেই সেগুলো পাওয়া যাবে বুঝিয়ে দাও। এমনি করে আগে যাও বাণিজ্য করতে, টাকাতে ওদের লোভ বাড়ুক, লোভ বাড়লেই দলাদলি হবে, সেই স্বুযোগে তুমি ওদের রাজ্য জয় করবে! টাকার চেয়ে বড় অস্ত্র আর কিছু নেই বৎস!'

তাই হ'ল।

শ্বেতদ্বীপের রাজা স্বুবর্ণপুরীর রাজার কাছে লোক পাঠালেন, 'তোমাদের দেশে ত প্রচুর শস্য হয়, আর আমরা খেতে পাইনে।

কিছু কিছু দাও না! অবিশ্যি অম্‌নি নেবো না, তার বদলে অন্য জিনিসও দেব—'

সুবর্ণপুরীর রাজা বললেন, 'বেশ ত!'

এল ওরা। সোনার টাকা দুহাতে ছড়াতে লাগল দেশে। যে জিনিষের কোন অভাব নেই তা দিয়ে যদি এমন চক্‌চকে টাকা পাওয়া যায় মন্দ কি? সুবর্ণপুরীর লোকরা এই ভেবে টাকা নিয়ে জমাতে লাগল। এমনি করে দেশে একদল হ'ল গরীব, একদল বড়লোক। যারা বড়লোক হ'ল তাদের লোভ বেড়ে গেল—আরও চাই। কারণ তারা ইতিমধ্যে বুঝেছিল যে টাকা দিয়ে এমন অনেক বিলাসসামগ্রী পাওয়া যায়, টাকা না থাকলে যার স্বপ্ন দেখাও দুরাশা। ফলে ঝগড়াঝাঁটি বেড়ে গেল—মিথ্যা কথা বলে, ঠকিয়ে, যেমন করে হোক তাদের আরও চাই।

ঠিক সেই সময়ে সুযোগ বুঝে শ্বেতদ্বীপের রাজা সুবর্ণপুরী আক্রমণ করলেন। সুবর্ণপুরীর রাজা প্রজাদের ডাকলেন যুদ্ধ করবার জন্য—কেউ এল না। ওদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি বেধে উঠেছে ভীষণ রকমের—আসবে কেন? বরং কেউ কেউ শত্রুপক্ষে যোগ দিলে।

ফলে—একরকম বিনা চেষ্টাতেই সুবর্ণপুরী শ্বেতদ্বীপের অধীন হ'ল। শুধু সুবর্ণপুরী নয়—বল্‌তে গেলে সারা পৃথিবীই ওদের হাতে এসে গেল। টাকা আর লোভ, এই হ'ল ওদের বড় অস্ত্র।

কিন্তু সবচেয়ে দুর্দশা হ'ল সুবর্ণপুরীরই। ভগবান ওদের অনেক দিয়েছিলেন, তাই ওরা এ জীবনের দুঃখকষ্ট কি জান্‌ত না—

লেখাপড়া নিয়েই থাক্‌ত সবাই। সংসারের খারাপ লোকদের সঙ্গে চল্‌তে গেলে যতটা প্যাঁচালো বুদ্ধি থাকা দরকার ততটা কারুরই ছিল না, শ্বেতদ্বীপের লোকেরা ওদের এই সরলতার সুযোগ নিয়ে খুব ঠকাতে লাগল। আর ঐশ্বর্যও ত এদের কম ছিল না। লোভটা সেইজন্যে সকলের বেশী এই দেশের ওপরই। ফলে অমন সোনার দেশ অভাবে যেন পুড়ে গেল! সুবর্ণপুরীর লোকরা খেতে পায় না, পরনে ওদের কাপড় নেই, লেখাপড়ার কথাও ভুলতে বসল। দেশে অরাজকতা দেখা দিল। রাজার লোকেরা এসেছে ওদের সর্বস্ব নিতে—শাসন করতে, রক্ষা করতে ত আসে নি! দুর্ভিক্ষ মড়ক এখন ওদের নিত্যসঙ্গী—পেটে অন্ন নেই বলে স্বাস্থ্যও দিন দিন সকলের খারাপ হয়ে গেল। এত বড় দেশের এতগুলো দেশের এতগুলো লোক বেঁচে রইল যেন মড়ার মত! বুদ্ধি নেই, স্বাস্থ্য নেই, আনন্দ নেই, জ্ঞানচর্চা নেই—শুধু একবেলা আধপেটা খেয়ে কোনমতে বেঁচে আছে, পরমায়ু ফুরিয়ে গেলে মরছে, এই পর্যন্ত!

সবচেয়ে মজার কথা এই যে, যে-দেশে অন্ন-বস্ত্রের লোভেই বিদেশীরা এসেছিল, সে দেশেরই শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে বিদেশ থেকে চাল আসে তবে খেতে পায়, কাপড় এলে তবে পরতে পায়। চাষীরা চাষ ভুলল, তাঁতীরা ভুলল কাপড় বুনতে—শুধু উদয়-অস্ত গোলামী করে বিদেশী রাজার লোকদের কাছে; সামান্য যা পায় আবার ওদের কাছেই খাবার, কাপড়, ওষুধ কেনবার নাম করে ফিরিয়ে দেয়।

অবস্থা যখন চরমে দাঁড়াল তখন লক্ষ্মী মুচ্‌কি হেসে নারায়ণকে বললেন, 'একবার চেয়ে ছ্যাখো!'

নারায়ণও মিষ্টি করে হেসে বললেন 'তুমিই ছ্যাখো'—

লক্ষ্মী চাইলেন, অবিশ্বাস-ভরে। মনের ভাব এই যে, নারায়ণ হেরে গেছেন এবং মানতে চাইছেন না—কী ছেলেমানুষী!

কিন্তু চেয়ে দেখেই চমকে উঠলেন—

ওমা এ কি?

ঐ শ্মশানপুরীর মধ্যে থেকেই এক শীর্ণ বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়েছেন। সর্বাঙ্গ নগ্ন—পরনে একটিমাত্র কটিবাস, শিরা-বার-করা দুর্বল হাতে একটি লাঠি, দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ—অত্যন্ত দুর্বল, অসহায় মানুষটি। বয়সে ও রোগে বেঁকে পড়েছেন।......কিছুই না, তবু লক্ষ্মী শিউরে উঠলেন।

বৃদ্ধ বললেন, 'শ্বেতদ্বীপের লোকেরা লক্ষ লক্ষ জোঁকের মত আমাদের দেশের ওপর এসে পড়েছে, রক্ত ফুরিয়ে এসেছে আমাদের, তবু ছাড়ছে না। এমন করলে যে আমরা কেউই বাঁচব না, এখনও হয়ত উপায় আছে ওদের তাড়াবার।'

কেউ শুনল তাঁর কথা, কেউ শুন্‌ল না। যারা শুন্‌ল তারাও অবিশ্বাসের স্বরেই বললে, 'ওদের তাড়ানো অত সহজ নয়।...... তা ছাড়া ওদের দোষ কি, আমরাই এক হতে পারি না, আমরাই পয়সার লোভে আমাদের সর্বনাশ করি। রোগে, অনাহারে, অশিক্ষায় আমাদের কি আছে? ওরা চলে গেলে আমরা আরও বেশী করে মরব।'

পঙ্গু বৃদ্ধ যেন সিংহ-গর্জন করে উঠলেন, বললেন, 'মিছে

কথা। এ কথা ওরাই শিখিয়েছে, ওদের সুবিধার জন্যে। যা কিছু আমাদের খারাপ, তার জন্য ওরাই দায়ী। আমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ওরা চলে গেলে। আগে ওদের তাড়াও।'

উপহাসের হাসি হেসে সবাই বললে, 'কেমন করে তাড়াবে ওদের ? ওদের সঙ্গে লড়াই করে পেরে উঠবে ?'

'লড়াই করবই না। এমন ব্যবস্থা করব যাতে ওরা আপনিই চলে যাবে।'

'কী করে ?' এবার যেন সকলের একটু আগ্রহ হ'ল কথাটা শোনবার।

বৃদ্ধ জবাব দিলেন, 'ওরা কি জন্যে এখনও আমাদের দেশে পড়ে রয়েছে ? আমাদের পয়সা লুঠ করবার জন্যেই ত ? এখনও আমাদের যা আছে যৎসামান্য, ওদের জিনিষ বেচে দাম হিসেবে তাও নিয়ে যাচ্ছে। ওদের জিনিষ কেনা বন্ধ করো, তা হ'লেই ওরা জব্দ হবে। এদেশে থেকে যদি ওদের লাভ না হয়, ওরা আপনিই ছেড়ে চলে যাবে।'

কথাটা সবাই বুঝল না। কেউ ঠাট্টা করলে, কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে। হ্যাঁ—তাই কখনও সম্ভব! খাবো কি, ওষুধ পাবো কোথায়, কাপড় কৈ ?

কিন্তু বৃদ্ধ হাল ছাড়লেন না। একা সেই লাঠি গাছিতে ভর দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে নিজের কথা বোঝাতে লাগলেন। বললেন, 'নিজেরা নিজেদের কাপড়ের সূতা কেটে নাও, নিজেদের তাঁতে বোনো। অভ্যেস নেই বলে

মোটা হবে? হোক না, তুদিন পরেই অভ্যেস হয়ে যাবে, আর না হয় মোটা কাপড়ই পরলে! এককালে ত তোমরাই সবচেয়ে সরু কাপড় বুনতে সেটা ভুলে যেও না। তোমাদের বনে অনেক ওষুধের গাছ আছে, তাই দিয়ে ওষুধ তৈরী করো। স্বাস্থ্যের নিয়ম মেনে চলো—অসুখ করবেই না। খাবার নেই? অনেক জমি এখনও পড়ে আছে, ওদের চাকরী ছেড়ে চাষ করো—খাবারের ভাবনা থাকবে না।……মোটকথা নিজেদের যা দরকার নিজেরা করে নাও, ওদের জিনিষ কিনো না।'

তুচারজন বৃদ্ধের কথা শুনলো। তাতেই শ্বেতদ্বীপের লোকের টনক নড়ল। তার চেষ্টা করতে লাগল বৃদ্ধকে জব্দ করার। আর তারা বৃদ্ধকে ভয় করছে দেখেই সুবর্ণপুরীর লোকরা বুঝতে পারল যে বৃদ্ধের কথায় কিছু সত্য আছে নিশ্চয়ই, নইলে ওরা ভয় পাবে কেন? পাগল বলে ত তাদের মত ওরা উড়িয়ে দিচ্ছে না!

তবু তুচারজন বললে, 'কিন্তু ওদের মত কলকারখানা ত আমাদের নেই, আমরা এত জিনিষ দেশের লোককে জোগাতে পারব কেন?'

বৃদ্ধ বললেন, 'জোগাতে হবে কেন? সবাই নিজের দরকার মত জিনিষ করে নেবে। আগে যেমন আমাদের ছিল, কলু তেল দেবে সবাইকে, তাকে তাঁতী দেবে কাপড়, মুচী দেবে জুতো, কবিরাজ দেবে ওষুধ!'

'তাই কি সম্ভব? সে সেকালে হ'ত—এখন সময় কৈ?'

'সময়ের অভাবটা যে তোমরাই সৃষ্টি করেছ ওদের মত

হ'তে গিয়ে, ওদের চাকরী করতে গিয়ে। আমরা যদি এমনই থাকি ত শ্বেতদ্বীপের লোকেরা গেলে অন্য দ্বীপের লোকেরা আসবে আমাদের লুঠ করতে, আমাদের দোহন করতে। আমাদের এদেশটা নাকি ভাল বাজার, ভাল বিক্রী হয় ওদের জিনিষ—তাই সবাই আসতে চায়। সেই বাজার নষ্ট করো, বিক্রী বন্ধ করো—আর কেউ আসবে না।'

এবার বুড়োর কথা অনেকে বুঝল। আরম্ভ হ'ল তাঁর কথামত কাজ। নিজেরা চাষ করে, নিজেদের চরকায় সূতো কাটে, কাপড় বোনে, ওষুধ তৈরী করে।······শ্বেতদ্বীপের লোকদের মুখ উঠল শুকিয়ে। ওরা নানা রকমে চেষ্টা করতে লাগল যাতে সুবর্ণপুরীর লোকদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না —একদিন ওদের সুবর্ণপুরী ছেড়ে দিয়ে চলে যেতেই হ'ল। আবার সুবর্ণপুরীতে স্বাস্থ্য-সুখ-শান্তি-জ্ঞান সব ফিরে এল। আবার সবাই বলতে লাগল, 'সুবর্ণপুরীর নাম সার্থক, হ্যাঁ, সোনার দেশ বটে !'

নারায়ণ হেসে লক্ষ্মীকে বললেন, 'দেখলে ?'

লক্ষ্মী মাথা হেঁট করে জবাব দিলেন, 'দেখলুম।'

থেমে যাওয়া সময়

এই কিছুদিন আগে খবরের কাগজে একটা মজার খবর বেরিয়েছিল। আসামের জঙ্গলে নাকি কয়েক লক্ষ বৎসর আগেকার স্যাঁৎসেতে বাষ্পে ঢাকা আব্‌হাওয়ার মধ্যে সেই সময়কারই অতিকায় জন্তু দেখতে পাওয়া গেছে! খুব ঢ্যাঙ্গা মানুষও নাকি তার পায়ের হাঁটু ছাড়িয়ে মাথা তুলতে পারে না—আর সে জন্তুটা নাকি বিরাট বটগাছের সব চেয়ে উঁচু ডাল থেকে কচি কচি ডগা ভেঙ্গে খায়।

সে এক বিরাট হৈ-চৈ কাণ্ড! আসাম সরকার বিলেতে লোক পাঠালেন বিশেষজ্ঞ আনতে। এখানকার প্রাণি-বিজ্ঞানবিদ্ ছুটোছুটি শুরু করে দিলেন। খবরের কাগজের লোক ছুটল ক্যামেরা নিয়ে। পুলিশ ছুটল স্থানীয় অধিবাসীদের সামলাতে, পাছে তারা অমন জন্তুটাকে মেরে ফ্যালে। চিড়িয়াখানায় সোর-গোল, ইতিহাসের পাতা থেকে সেই প্রাণীর কাল্পনিক ছবি নিয়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে জটলা! কেউ বলল গাঁজা, কেউ বললে, 'না হে হিমালয়ান রিজ্যনে সবই সম্ভব। ওর ঐ বিরাট গহ্বরে কি আছে কে বলতে পারে! মনে নেই? সেই ডুয়ার্সের জঙ্গলে কুড়ি ইঞ্চি পায়ের ছাপ, কে যেন সাত ফুট মানুষও দেখেছিল? ও-ও ত তোমার সাব-হিমালয়ান রিজ্যন, আধা হিমালয়ান অঞ্চল।'

এমনি করে জল্পনা-কল্পনা উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা এবং বাজী রাখারাখির শেষ রইল না একেবারে! কত খবরের কাগজে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পর্যন্ত বেরিয়ে গেল! একগাদা টাকা খরচ

করে মার্কিন হুজুগে-বড়লোকেরা—মানে যাদের এমনি হুজুগ ছাড়া পয়সা খরচ করবার অন্য পথ নেই—হাওয়াই জাহাজ চেপে ছুটে এল মজা দেখতে, আরও কত কি!

তারপর এক সময়ে আবার সব জুড়িয়ে গেল! ঠিক কী হল, ব্যাপারটার কোন তদ্বির হ'ল কিনা তাও জানা গেল না। আসাম গভর্ণমেণ্টও কোন বিবৃতি দিলেন না ভাল করে এ সম্বন্ধে। হয়ত বা সরকারী ফাইলের মধ্যে ধামাচাপাই পড়ে গেল ব্যাপারটা। তুচ্ছ ছোটখাটো ঝগড়া, জাতিগত স্বার্থের কচকচির মধ্যে এত বড় একটা বৈজ্ঞানিক বিপর্যয়ের সংবাদ সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেল, ও সব নিয়ে কে এখন মাথা ঘামায়, তুমিও যেমন! শেষ পর্যন্ত স্থির হ'ল যে ওটা গাঁজাই—অর্থাৎ গাঁজাখুরী খবর।

এরই মধ্যে অমিয় ভাদুড়ী একদিন আমার কাছে এসে হাজির। পরণে হাফ প্যাণ্ট, খাকি বুশশার্ট, কাঁধে একটা কাঁধ-ঝোলা তাতেই একটা পাৎলা কম্বল ঝোলানো! একেবারে এক্স্‌পিডিশ্যানের বেশ!

'ব্যাপার কী রে?' প্রশ্ন করলুম।

'চললুম।' শুধু সংক্ষেপে উত্তর দিলে সে!

'কোথায়? কেন? কবে?' একসঙ্গে আবার প্রশ্ন করি।

'আজই যাচ্ছি। আসাম মেলে—আর মাত্র একঘণ্টা সময় আছে। যদি আর না ফিরি মাকে একটু দেখিস'—নাটকীয়ভাবে বলে সে থামলে।

কিছুই বুঝতে পারি না ব্যাপার কি। ব্যাকুল ভাবে বলি, 'কিন্তু হ'লটা কি, যে জন্যে একেবারে উইল করে যেতে হচ্ছে?'

'যাচ্ছি হিমালয়ের জঙ্গলে সেই অতিকায় জন্তু দেখতে। কী জানি বলা ত যায় না, ওখানে নানারকম জন্তু আছে, গণ্ডারও হয়ত পাওয়া যায়, ভালুকের ত কথাই নেই, তার ওপর সাপ—বড় বড় ময়াল, পাইথন।'

সে চোখ বড় করে সংবাদটা দিলে; অর্থাৎ আমাকে অভিভূত করার চেষ্টা।

'কিন্তু তুই তা বলে এই অসময়ে পড়াশুনো ছেড়ে একা চললি কি করতে? তোর কি এখন এই সব বুনো হাঁস তাড়া করে বেড়াবার সময়? তা ছাড়া তুই মায়ের এক ছেলে। এই ছুতোয় বাড়ি থেকে পালাচ্ছিস!'

'ছুতো নয় রে ছুতো নয়। গভর্ণমেণ্ট ত কিছু করলে না—যদি আমি এ রহস্য ভেদ করতে পারি ত, শুধু যে আমারই একটা অক্ষয় কীর্তি থেকে যাবে তাই নয়—এই সব মূর্খ গভর্ণমেণ্টকেও কিছু শিক্ষা দেওয়া হবে!'

'ও! তুই সেই গাঁজার পেছনে ছুটছিস পড়াশুনা সব কামাই করে? ও ত স্রেফ গাঁজা! শুনিস্‌নি পুলিশ অনেক কষ্ট করেও সে জন্তু ত দূরে থাক, সে রকম জায়গাই খুঁজে পায়নি!'

'আরে, ওরা ত কাজ করে হুকুম তামিল করতে হবে বলে তাই। ওরা মূর্খ, ওদের সাধ্য কি এসব ব্যাপারের মর্ম বোঝে? এতে যে সমস্ত মানব-ইতিহাসের তত্ত্বটা বদলে দিতে পারা যায়, সে সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে ওদের, না জ্ঞান কী বস্তু তাই বোঝে? তা বলে আমি ত আর চুপ করে থাক্‌তে পারি না।'

'কেন তুমিই বা এমন কি মাতব্বর?' বিদ্রূপ করি ওকে, 'এত সব রথারথী থাকতে—'

অমিয় বাধা দিয়ে বললে, 'তা নয়। মনে আছে অনেকদিন আগে, মানে মরবার কিছু আগে বাবা একটা কথা গল্প করেন। কে একজন যেন মিষ্টার দাস না রায়, সুধীর বাবুর বইয়ের দোকানে বসে গল্প করেন—এখন থেকে ঠিক বিশবছর আগে, আর বাবা যখন বলেছিলেন তখন থেকেও চৌদ্দবছর আগে যে, সে ভদ্রলোক সরকারী কাজে একবার নাগাদের দেশে গিয়েছিলেন। ঠিক সাধারণত যে সব কর্মচারীরা যায়,—কোন মতে কাজ সেরে শহরে পালিয়ে আসতে পারলে বাঁচে, সে রকম তিনি ছিলেন না, তাঁরও মনে এসব ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসা ছিল। তিনি যেখানে যেতেন সেখানে কী কী দেখবার জিনিস আছে, স্থানীয় ইতিহাস যদি কিছু পাওয়া যায়, কোন্ শিল্প সেখানকার বিখ্যাত, মানুষদের জীবন-যাত্রার ধরন কি—এসব খোঁজ করতেন। একবার এমনিই খোঁজ করতে করতে এক নাগাদের গাঁয়ে গিয়ে পড়েন। সেখানকার সর্দারের সঙ্গে কিছুদিন আগেও একবার এসে ওঁর খুব ভাব হয়েছিল। পরিচয় ত ছিলই তার ওপর এবার আবার তিনি সঙ্গে বিস্তর উপঢৌকন নিয়ে গিয়েছিলেন, ছুঁচ-সুতো, বোতাম, চায়ের কাপ, কাঁচকড়ার মালা, তাস—এই সব। সর্দার খুব খুশি হয়ে গ্রামের অতিথিশালায় তিন দিন ওঁকে ধরে রাখে, একজোড়া হাতির দাঁত আর ভালুকের চামড়া উপহার দেয়, আর শেষদিনে বলে যে তুই কেবল এসে বিরক্ত করিস—কী নতুন জিনিস আছে দেখবার জন্য, তা যাবি এক জায়গায়? ও ভদ্রলোক ত খুব

উৎসাহের সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। সর্দার বললে, পথ খুব দুর্গম কিন্তু, একদিনের রাস্তা! উনি বললেন, তা হোক্। তখন সে নিয়ে গেল ওঁকে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দিয়ে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ ধরে। ন' ঘণ্টা ক্রমাগত হেঁটে, তিন ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে আবার দু'ঘণ্টা হেঁটে, সন্ধ্যার কিছু পরে গিয়ে পৌঁছলেন একটা জায়গায়। সেখানে কোন আশ্রয় নেই। একটা পাহাড়ের গুহার সামনে আগুন জ্বেলে রাত কাটাতে হ'ল। আবার পরের দিন ভোরে অল্প একটু জঙ্গল ভেঙ্গে সে যেখানে নিয়ে গেল সেখানে এখনও জলা স্যাঁৎসেতে—সেই প্রাগৈতিহাসিক দিনের মত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বড় গাছের ডালপালা ভেদ করে সূর্যকিরণ আসে না সেখানে কখনও, আর সর্বদা একটা ধোঁয়া-ধোঁয়া কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব। সেই রকম স্থানে অনেকক্ষণ একটা গাছের ডালে বসে অপেক্ষা করার পর দূরে পাঁকের মধ্যে বিরাট কি একটা আলোড়ন উঠল, যেন একপাল হাতী জলে নেমেছে! সর্দার তাঁকে ইশারা করে জানালে যে—ঐ আসছে। তারপর আরও খানিকটা পরে আওয়াজটা যখন কাছে এল তখন হঠাৎ সে আঙ্গুল দিয়ে দেখালে—ঐ। ভদ্রলোক চেয়ে দেখেন যে একটা পাহাড় যেন হেঁটে হেঁটে আসছে! অবশ্য খুব কাছে সে আসেনি, এলে বিপদ হবে জেনেই সর্দার এমন জায়গায় বসেছিল, যেখানে সে আসে না। কিন্তু যতটা দেখা গিয়েছিল তাতে মনে হয় গিরগিটির মত একটা অতিকায় প্রাণী, মোটে দুটো পা, বিরাট গলা বাড়িয়ে প্রকাণ্ড মহীরুহের ওপর থেকে কচি পাতা খাচ্ছে আর ল্যাজের ঝাপটে কাদা ছেট্‌কাচ্ছে। সেই মূর্তি দেখেই ত তাঁর হয়ে

গিয়েছিল—তিনি সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ে দে-ছুট ! সর্দারও জন্তুটাকে প্রণাম করে সরে পড়ল। সে বলেছিল যে উনি নাকি কোন্ দেবতা !'

এই পর্যন্ত বলে অমিয় থামল।

বললুম, 'তারপর ?'

'তাঁর সঙ্গে ক্যামেরা ছিল না। তিনি স্থানটাও ঠিক করে বলতে পারেননি—সর্দার এমন পথে তাকে নিয়ে গিয়েছিল যে বোঝা শক্ত। চেনা আরও কঠিন। সুতরাং সবাই তাঁর কথা গাঁজা বলেই উড়িয়ে দেয়। তিনি আর একবার গিয়ে ছবি আনবেন স্থির করেছিলেন হঠাৎ ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মারা যান। সেই থেকে কথাটা চাপা পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমার বাবা মনে করে রেখেছিলেন, মরবার কিছুদিন আগে আমাকে তিনি একদিন গল্প করেন। কথাটা খুব অবিশ্বাসও করেননি। তিনি বলেছিলেন যে, সে ভদ্রলোক মিছে কথা বাড়িয়ে বলবার লোক নন্। আর তা যে নন্ এই খবরেই তা প্রমাণ, এতকাল পরে সে কথাটা এমন করে উঠবে কেন ? যাক্‌গে, আমার সময় বড় কম, চললুম।'

কথাটা ভাল করে বুঝে তার সঙ্গে তর্ক করার কিংবা কোন বাধা দেবার আগেই সে এক লাফে বেরিয়ে চলে গেল।

এর পর তিন মাস অমিয়র কোন পাত্তা নেই। ওর বিধবা মা কেঁদে মরেন, কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে দেওয়া হবে কিনা ওর কাকা চিন্তা করেন। আসাম পুলিশেও খবর দেওয়া হয়, কিন্তু তারা খুজে পায় না ওকে।

হঠাৎ তিন মাস পরে সে ঘুরে এল। ওর অমন সোনালী রং যেন কালি হয়ে গিয়েছে! আমাশা আর জ্বরে শীর্ণ—যেন ধুঁক্‌ছে একেবারে। প্রথমটা ওর সঙ্গে কোন কথাই কওয়া গেল না, কিছুদিন চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে উঠলে একে একে সব গল্পটা শুনলাম। বিশ্বাস অবশ্য আজও করিনি, কিন্তু গল্পটা শুনে আপনারা যদি কেউ এ সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর করতে চান ত করতে পারেন। সেই জন্যই সেটা শোনাচ্ছি আপনাদের—

এখান থেকে গৌহাটি, সেখান থেকে অনেক খোঁজ-খবর করে ও নাগাদের দেশে পৌঁছায়। ওর অনেক অসুবিধা ছিল, যে কথাগুলো, অভিজ্ঞতা কম বলে, এখানে থাক্‌তে ও ভেবে দেখেনি। প্রথমত টাকা ছিল না বেশি, দ্বিতীয়ত এর আগে কখনও আসামে যায়নি। ভৌগোলিক অবস্থাটা মোটে জানা নেই। তার ওপর সবচেয়ে বড় কথা, ওদের ভাষা জানে না। অমিয় যখন কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তখন তারা বোঝে না, আবার তারা যখন উত্তর দেয়—ওরও সেই অবস্থা। তবু খুঁজে খুঁজে উত্তর-পশ্চিম আসামের দুর্ভেদ্য পাহাড়ে-জঙ্গলে গিয়ে পৌঁছল। পথ দুর্গম, গাড়ি-ঘোড়া নেই। হাঁটা-পথে রাস্তা ভুল হয়, প্রশ্ন করবে কাকে? তাছাড়া পদে পদে বুনো হাতীর ভয়, ভাল্লুকের ভয়, সাপের ভয়। তার ওপর আছে নাগা আর কুকীরা। প্রথম প্রথম ওর হাফ-প্যাণ্ট দেখে পুলিসের লোক বলে সন্দেহ করত—সে এক জ্বালা! ওরা পুলিসের ওপর ভারি চটা—পুলিস ওদের বড় বিরক্ত করে। প্রত্যেক লোকালয়ে গিয়ে ওকে আগে প্রমাণ করতে হ'ত যে,

ও পুলিস নয়—বেড়াতে এসেছে। সহজে তা প্রমাণ হ'ত না—এক একসময় ওদের বিষাক্ত তীর বা বল্লমে প্রাণ যেতে যেতে বেঁচে গিয়েছে! যাত্রী বলে বোঝাতে পারলে তবে আতিথ্য নিতে পারত গ্রামে, নইলে থাকবে কোথায়? সে আতিথ্যও খুব নিরাপদ নয় অবশ্য। এক গ্রামের সর্দার ওকে একবার গ্রামের বাইরে পঞ্চায়েতী অতিথিশালায় থাকতে দিলে। ছিটেবাঁশের বেড়ায় মাটি নিকানো, বেশ ঝক্‌ঝকে ঘরটি। একপাশে বাঁশেরই মাচায় চৌকি তৈরী করা, তাতে শুক্‌নো পাতার বিছানা। ফল মূল দুধ, সেবার ব্যবস্থাও মন্দ নয়—কিন্তু একটা ব্যাপারে ওর খট্‌কা লাগল। প্রকাণ্ড ঘর, তিনটে দোরের খিলেনও রয়েছে কিন্তু তাতে কোন আগড় বা কপাট নেই। সর্দারকে প্রশ্ন করতে সে বেশ সহজকণ্ঠে শুনিয়ে গেল, কপাট করে ত কোন লাভ নেই। বুনোহাতীর পাল যখন আসে, তখন দরজা বন্ধ দেখলেই ভেঙ্গে দিয়ে যায়। আচ্ছা আসি, বলে সে বেরিয়ে গেল। সামনেই পাহাড়ে-রাস্তা, ওপরে পাহাড়, নিচে খাদ। এরই মধ্যে যদি বুনোহাতীর পাল থাকে? তাছাড়া খোলা দরজা—বাঘ ভাল্লুক ত যে কোন মুহূর্তেই আসতে পারে। শুকনো পাতা জ্বেলে আগুন করবে বেচারী, সে উপায়ও নেই, আগুন দেখলেই হয়ত হাতীর পাল এসে হাজির হবে। অমিয় বলে সেই একরাত্রের দুশ্চিন্তায় তার এক বছরের পরমায়ু চলে গিয়েছিল।

অমিয় সতি-সত্যি অনেকবারই মৃত্যু-দোর পর্যন্ত পৌঁছে ফিরে এসেছে। একবার ওর চোখের সামনেই বুনো হাতী একটা মোটর

গাড়ি উল্‌টে খাদে ফেলে দিলে। সে নিজেও তার সামনে পড়েছিল, অনেক কষ্টে একটা ঢালু জায়গায় গাছ ধরে ঝুলে প্রাণ বাঁচায়, আর একবার একটা বাঘের সামনে পড়ে। দূর থেকে একজন পাহাড়ী তীর মেরে ওকে রক্ষা করে।

তবু অমিয় হাল ছাড়েনি। বনের ফল-মূল খেয়ে আর এইভাবে চলে এক সময় ও এমন একটা স্থানে পৌঁছল যেটা দক্ষিণ হিমালয়ের একটা দুর্ভেদ্য ও একেবারে অনাবিষ্কৃত অঞ্চল। সেটা আসাম সরকারের অধীন কি ভূটানের কি তিব্বতের, তা বোধ হয় কোন দেশের সরকারই জানে না। কোন মানুষ তার আগে সেখানে এসেছে কিনা বলা শক্ত। কিন্তু সভ্য মানুষ যে যায়নি এটা ঠিক। কোন পায়ে-হাঁটা পথের চিহ্ন কোথাও নেই, সূর্য দেখে দিক্ বুঝতে হয়। পথ নিজে নিজে করে নিতে হয়। ওর সঙ্গে বহু দূর পর্যন্ত এক নাগা গিয়েছিল, তারপর সেও হাল ছেড়ে পালিয়ে আসে।

কিন্তু অঞ্চলটায় পৌঁছে ওকে অনেকটা নেমে আসতে হয়েছিল এটা ঠিক, মানে পার্বত্য অঞ্চল ঠিকই, কিন্তু খুব উঁচু নয়! অর্থাৎ হিমালয়ের এ অঞ্চলটা যেন টোল খেয়ে দেবে গেছে! ফলে এখানটায় খুব শীত নয় কিন্তু কেমন একটা চাপা চাপা আবহাওয়া। সর্বদাই মেঘলা ভাব, নিবিড় ঘন লতাপাতা ও জঙ্গল ভেদ করে সূর্য-কিরণ সে অঞ্চলে কখনই পৌঁছয় না, চারিদিকের উত্তুঙ্গ পাহাড়ে দিনের আলো যেন ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায়, ওখানে আসে না। আর একটা ধোঁয়া-ধোঁয়া ভাব, যেন বাষ্প জমে আছে খানিকটা!

অমিয় কিছুই জানত না, কিন্তু আবহাওয়াতে মনে হল সে যা দেখতে চায় তা এই স্থানেই মিলবে! কোথায় মিলবে, কোন্ দিকে তার যাওয়া উচিত, তা অবশ্য সে জানে না। সুতরাং শুধুই ঘুরে বেড়ায় ইতস্তত। সঙ্গে খাবার নেই। সামান্য যা বিস্কুট ছিল, তা শেষ হয়ে গিয়েছে। টর্চের ব্যাটারি নিবু নিবু, দেশলাই ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে তার। এ অবস্থায় আর কদিন থাকতে পারে মানুষ? যা তা ফল খেয়ে আমাশা, রোজ জ্বর আসে! সঙ্গে অস্ত্র নেই, ভরসার মধ্যে এক নাগার কাছে থেকে চেয়ে নেওয়া এক বর্শা। তাও কোন জন্তুর সামনে পড়লে হাতে থাকবে কিনা কে জানে?

অগত্যা ওকে ফিরতে হ'ল। কোনমতে তিনটে দিন সেই ভাবে কাটিয়ে হতাশ হয়ে ও ফিরছে—আন্দাজে আন্দাজে দক্ষিণ দিক হিসেব করে করে, এমন সময় এক অঘটন। নিবিড় জঙ্গলে আগাছা সরাতে সরাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে একটা গাছের ডালে বসে বিশ্রাম করছে এবং পা থেকে এক মনে জোঁক ছাড়াচ্ছে, এমন সময় সহসা পেছনে যেন মানুষের কণ্ঠস্বর! চমকে চেঁচিয়ে ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠে দেখলে যে, সত্যি সত্যিই মানুষ। চুলে দাড়িতে লোমে জট পাকিয়ে কতকটা বনমানুষের মত দেখতে হয়েছে তাকে, গায়ে বস্ত্রের বালাই নেই, কোন মতে কতকগুলো শুকনো পাতায় লজ্জা নিবারণ করা হয়েছে মাত্র। চোখের দৃষ্টি উগ্র, গায়ের রং ফরসা, কিন্তু লোমে ও ময়লায় বোঝবার উপায় নেই, নখগুলো বড় হয়ে বেঁকে গেছে ক্রমশ।

ওকে ঐভাবে ভয় পেতে দেখে সে হাসল। এব্ড়ো খেব্ড়ো

দাঁত, কিন্তু একটাও ভাঙ্গা নয়। তারপর ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে প্রশ্ন করলে, ‘তুমি কে বেটা ? এখানে কেন এসেছ, তুমি কি আংরেজের গোয়েন্দা ?’

অমিয়রও হিন্দীজ্ঞান তথৈবচ। তার উপর ঠক্ ঠক করে কাঁপছে তখন। তবু কোন মতে বুঝিয়ে দিলে সে গোয়েন্দা নয়, সে বাঙ্গালী। সে অদ্ভুত একটা জন্তুর সন্ধানে এখানে এসে পড়েছে।

সে লোকটির তবুও যেন সন্দেহ যায় না। বললে, ‘সচ্ ? আচ্ছা! মহারাণী ভিক্টোরিয়া এখনও রাণী আছেন, না বাহাদুর শাহের ফৌজ আবার দিল্লী দখল করেছে ? খবর জানো কিছু ?’

অমিয় ত হাঁ। লোকটা পাগল ত বটেই, কিন্তু মার-ধোর না করে ওকে।

ওর মুখের ভাব দেখে সে দু-পা এগিয়ে এল। প্রশ্ন করল, ‘কথা বুঝতে পারছ না ?’

‘আ—আপনি যাদের কথা বলছেন, তারা ত কবেই মারা গেছে !’

‘মরে গেছে ? ঝুটি বাত।’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ। মহারাণী ভিক্টোরিয়া মারা গেছেন, তাঁর ছেলে গেছে, নাতি গেছে এখন নাতির ছেলে রাজা। তা ছাড়া এখন আর ইংরেজদের রাজত্ব নেই। আমরা স্বাধীন হয়েছি।’

‘তাই নাকি ?’ ওর যেন বিশ্বাসই হয় না। সে বললে, ‘তা হলে কি আবার সিপাইরা লেগেছিল লড়াইতে ?’

'উহুঁ, এবার সিপাই নয়। মহাত্মা গান্ধী নিরস্ত্র আন্দোলনে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন।'

'মহাত্মা গান্ধী ? সে আবার কে ?'

এতক্ষণে অমিয়র মনে হ'ল যে, কোথায় একটা গণ্ডগোল হচ্ছে! সে সংক্ষেপে মহাত্মা গান্ধীজীর পরিচয়টা দিলে। তখন লোকটি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে এটা কত সম্বৎ প্রশ্ন করলে। সম্বৎ কাকে বলে অমিয় জানে না—সে ইংরেজী সাল বললে। লোকটি আরও খানিকটা চুপ করে থেকে বললে, 'সিপাহী বিদ্রোহের কথা শুনেছ ?'

'শুনেছি! সে ত আঠারশ সাতান্ন সালের কথা। এখন থেকে প্রায় একানব্বই বছর আগেকার কথা!'

লোকটা বিহ্বল ভাবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বললে, 'ঝুট্। আমি কে জানো ? আমি নানা সাহেব। তাঁতিয়া টোপী আর আমি সিপাইদের চালিয়ে ছিলুম।'

এবার অমিয়র পালা। সে খানিকটা চুপ করে থেকে ওরই মত গলার স্বর করে বললে, 'ঝুট্! তুমি আসলে পাগল।'

এইবার লোকটা যেন জ্বলে উঠল একেবারে, চোখ রক্তবর্ণ ক'রে কী কতকগুলো হড়বড় করে বকে গেল! সে যে কি ভাষা, তা অমিয় বুঝতে পারলে না। কিন্তু আমার মুখে মারাঠী বুলি শুনে বলেছিল পরে যে, সে কতকটা এই রকমই বটে।

তারপর লোকটি হঠাৎ এগিয়ে এসে ওর সেই থাবার মত নোংরা হাতে ওকে চেপে ধরে বললে, 'আমি সূরয নারায়ণের

দিব্যি করছি, গঙ্গামায়ির দিব্যি করছি, আমিই নানা সাহেব। বিশ্বাস করো! আংরেজরা টোপীকে ফাঁসি দিয়েছে আমি জানি, তাই পালিয়ে এসেছি। ঠিক কতদিন এসেছি বলতে পারব না, তবে তুমি যতদিন বলছ অতদিন হয়নি নিশ্চয়ই, বড়জোর তিন কি চার বছর।'

অমিয় ত ভয়ে কাঠ! কোনমতে পাগলটার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারলে বাঁচে! তবে সে জোর গলায় বললে, 'আঠারশ সাতান্নতে সিপাই বিদ্রোহ হয়—এটা উনিশশো আটচল্লিশ। আমি তোমাকে ঠিকই বলছি। শুনেছি আমার ঠাকুর্দার বাবা সে সময়ে মিরাটে ছিলেন।'

লোকটি খানিকটা বিহ্বল ভাবে ওর দিকে চেয়ে থেকে ওর হাত ছেড়ে দিলে। তারপর খানিকটা চোখ বুজে থেকে বলল, 'আমি কি সত্যিই পাগল হয়ে গেছি তাহ'লে? এতদিন কেটে গেল, অথচ কিছুই টের পাইনি? অবিশ্যি সময়ের হিসেব রাখা এখানে সম্ভব নয়, তা' বলে এত তফাৎ!'

তারপর সহসা যেন একটা চমক ভেঙ্গে উঠে সে বললে, 'আচ্ছা, তুমি কি দেখতে এখানে এসেছ বললে?'

অমিয় ওকে সব বুঝিয়ে বললে, মানে যতটা বোঝানো সম্ভব। সব শুনে সে বললে, 'আচ্ছা! সৃষ্টির আগে এই রকম সব জানোয়ার ছিল নাকি পৃথিবীতে? আমরা এসব খবর কিছুই জানি না। কিন্তু তুমি যে রকম জানোয়ার বলছ সে রকম কেন শুধু, আরও ঢের অদ্ভুত রকমের অতিকায় জন্তু আমি দেখেছি। প্রথমটা ভাবতুম ভূত, তারপর মনে করেছিলুম যে এদেরই

আমাদের শাস্ত্রে দানব বলে। আবার এক রকমের বিরাট পাখী আছে গলাটা সাপের মত অথচ এধারে পাখা—বিরাট পাখা। সে স্থানটা কিন্তু এখান থেকে অনেক দূর, আর যে বিশ্রী পাঁক—তরল পাঁকের সমুদ্র যেন! আমি হঠাৎ গিয়ে পড়ে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছি। ঐ একটা আঁশওয়ালা দৈত্যের মত গিরগিটি তাড়া করেছিল। ওখান থেকেই কোন-একটা হয়ত ছিটকে গিয়ে পড়েছিল লোকালয়ে। সে স্থান অত্যন্ত দুর্গম, তুমি যেতে চাও?'

অমিয়র অবশ্য যাবার মত অবস্থা ছিল না তবু সে বললে, 'আপনি পথ দেখাবেন?'

মাথা নেড়ে নানা সাহেব বললে, 'না, সেখানে যেতে আমার সাহসে কুলোবে না, তোমার গিয়ে কাজ নেই; তুমি ফিরে যাও।'

তারপর দুজনেই চুপচাপ।

খানিকটা পরে নানা সাহেব বললে, 'আমি একটা কথা কি ভাবছি জানো?'

'কি?' অমিয় প্রশ্ন করে।

'এখানটায় বোধহয় সেই সৃষ্টির আদিকাল থেকে সময় হঠাৎ থেমে গেছে। কাল এগোয়নি, বয়স বাড়েনি—সেই সময়েই একটা বছর থেকে সব থমকে গেছে। আমিও তার মধ্যে এসে পড়ে সেই বয়সেই থেকে গেছি—এর ভেতর যে একানব্বুই বছর কেটে গেছে তা বুঝতেই পারিনি!...নইলে এমন হবে কেন?'

লোকটা যে বদ্ধ পাগল সে সম্বন্ধে যেটুকু সন্দেহ ছিল অমিয়র, তা কেটে গেল। সে তখন পালাতে পারলে বাঁচে!

কোনমতে ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললে, 'ঠিক! ঠিক!'

লোকটি বললে, 'তা তুমিও এখানে থেকে যাও না! থাকবে?'

অমিয় বললে, 'না, সে আমি পারব না। তার চেয়ে আপনি ফিরে চলুন। দেশ স্বাধীন হয়েছে, আপনাকে সকলে মাথায় করে রাখবে। হয়ত স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি আপনিই হবেন!'

'তাই নাকি? যাবো তোমার সঙ্গে? আংরেজ নেই, ঠিক জান? যদি ধরে ফাঁসী দেয়?' চোখ যেন জ্বলতে লাগলো, আগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে।

অমিয় কথাটা বলে ফেলে ফ্যাসাদে পড়ল। তবু মিছে কথা বলতে পারলে না। সে বললে, 'কোন ভয় নেই—আপনি নির্ভয়ে চলুন।'

লোকটি তখনই বেরিয়ে পড়ল ওর সঙ্গে, সেও বিশেষ পথ চেনে না—তবুও অমিয়র সঙ্গে হাৎড়ে হাৎড়ে চলল! এরই ভেতর একবার একটা প্রকাণ্ড কী পাখী বিশ্রী একটা গর্জন করে চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল! এত ভয় পেয়েছিল অমিয় যে ভাল করে চাইতে পারলে না অনেকক্ষণ, তবু ওর সন্দেহ হল সেটা টেরোড্যাক্‌টিল জাতীয় জীব।

নানা সাহেব এত কাল এদেশে থেকে খাদ্য-খাবারের খোঁজ রাখতেন—তিনি খুঁজে খুঁজে নানা রকমের ফল সংগ্রহ করে অমিয়কে দিলেন।

কিন্তু বেচারীর আর সভ্যতার মুখ দেখা হয়ে উঠল না। সেই সাঁৎসেতে ঠাণ্ডা হিমালয়ের গহ্বর থেকে মুক্তি পেয়ে ওরা

লোকালয়ের দিকে উঠে আসতেই বিচিত্র এক ঘটনা ঘটল। হঠাৎ লোকটি যেন শুকিয়ে কুঁকড়ে বুড়ো হয়ে গেল অসম্ভব রকমের! বোধহয় চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল—সে এমন পরিবর্তন যে অমিয় ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল! শেষে সে যখন পথের ধারেই পড়ে মিনিট কতকের মধ্যে মারা গেল, তখন আর ওর জ্ঞান রইল না—ভয়ে দিশাহারা হয়ে পাগলের মত খানিকটা ছুটে গিয়ে এক গ্রামের ধারে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। ভাগ্যিস্ নাগারা দেখতে পেয়েছিল ওকে! কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সেবা করে দুধ খাইয়ে তবে চাঙ্গা করে।

কিন্তু অমিয়র গল্পের সেইটাই শেষ নয়।

সে বলে যে সে যে-কদিন ঐ অঞ্চলে ঘুরেছে তার কোন হিসাব পাচ্ছে না অর্থাৎ সব দিনগুলো ধরলে ওর তিন মাসের বেশী হয়—কিন্তু ঠিক ঐ-কটা দিনই কি করে বাদ পড়ে গেছে!

বিকারের খেয়ালে কী দেখেছে হয়ত—কে জানে!

কিন্তু অমিয় তা স্বীকার করে না।

ভ্রমণকাহিনী

আজ এমন একটি ছেলের গল্প বলব যে আজ আর ছেলে নেই, তার বয়স অন্ততঃ চল্লিশে পোঁচেছে। কিন্তু যেদিন সে ছিল কিশোর বয়সী, সেই সময়েই নিজে দরিদ্র হয়েও অনায়াসে নিজের সুখস্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে আর একটি দুঃস্থ লোকের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছিল। তার নাম? সত্যি নাম নাই-বা বল্লুম! কেন না, হয়ত সে আজও বেঁচে আছে! যদি আমার এসব কথা কানে যায় তো লজ্জা পাবে। নিজের প্রশংসা সে বেচারা কখনও শুনতে পারত না, বড্ড লজ্জা পেত! ধরা যাক্ তার নাম ফণী। সে আর আমি ছেলেবেলায় কাশীতে একই ইস্কুলে, একই ক্লাসে পড়েছি। গল্পের সবটা আমার নিজের দেখা নয়—পরের মুখেই শুনেছি। তবে মানুষটিকে দেখা আছে বলেই কাহিনীটা আমি বিশ্বাস করি। আমি জানি এ সত্য, এ ফণীর পক্ষেই সম্ভব।

ফণী ছিল যেমন রোগা, তেমনি ঢ্যাঙ্গা আর তেমনি কালো। বোধ হয় অত লম্বা বলে চলতে গেলেই সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ত, মনে হত আলকাত্‌রা মাখানো একটা বাঁকা কঞ্চি হেঁটে চলেছে! কিন্তু চেহারা যাই হোক্, আমরা সবাই তাকে বড় ভালবাসতুম। ছেলেটার অন্তর ছিল বড় সাদা পরিষ্কার; যখনই হাসত সে, দিল-খুলে হা-হা-হা করে হাসত। যারা এ রকম হাসতে পারে, তাদের মন বড় সরল হয়। তারাই হয় সকলের প্রিয়। তা ছাড়া ফণী ছিল অত্যন্ত কৌতুক-প্রিয়, মানুষকে

হাসাতে পারত সে বেদম। সর্বদাই একটা না একটা ঠাট্টা— তার মুখে লেগেই থাকতো, অথচ মজা ছিল এই যে যাদের নিয়ে ঠাট্টা করত তারা কখনও কেউ ওর উপর রাগ করত না, এমন একটা মিষ্টি স্বভাব ছিল ওর। একবার ও আমাদের ক্লাস-টিচার শ্যামবাবুর সামনেই তাঁর হাঁটার নকল করে দেখিয়ে দিলে। আমরা ভাবলুম, তিনি হয়ত ওতে অপমান বোধ করবেন, হয়ত বা রাগ করবেন, কিন্তু এমনই ফণীর হাসির ছোঁয়াচ যে নকল দেখাবার পর ফণী নিজে হেসে উঠতেই শ্যামবাবুও হো হো করে হেসে উঠে ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে চলে গেলেন।

ফণীরা ছিল অত্যন্ত গরীব। ওর বাবা কাশীরই এক ইস্কুলে বাংলার পণ্ডিত ছিলেন, মাইনে পেতেন মোট কুড়ি টাকা। কাশীতে তখনকার দিনে কুড়ি টাকা অবশ্য খুব কম নয় তবু ওদের সংসার ছিল বেশ বড়, ওর এক কাকা, মা, বাবা, আরও চার পাঁচটি ভাইবোন, খুবই কষ্ট করে চালাতে হ'ত ওদের। ফণী বেচারাকে ত আমি কখনও জামা গায়ে দিতে দেখিনি। একটি ছেঁড়া উড়ুনি গায়ে, আর পায়ে একটা খড়ম, নয়ত একেবারে খালি পা। এই বেশেই তার চিরকাল গেল। এমন কি, অনেক দিন পরে যখন সে স্কুল ছেড়ে কলেজে উঠেছে তখন হঠাৎ একদিন দেখা হয়েছিল। তখন দেখি তার ঐ বেশই বাহাল আছে, ঐ খড়ম পায়ে দিয়েই সে স্বচ্ছন্দে রোজ চার মাইল পথ হেঁটে নাগোয়া যায় কলেজে পড়তে, আবার অতটা পথ হেঁটে ফেরে। তবুও কি কুড়ি টাকা আয়ে সংসার চলে? কিছু কিছু যজমানীর কাজ করতেন ওর বাবা, ব্রাহ্মণ-বিদায়

প্রভৃতি হলেও দু-চার পয়সা পাওয়া যেত—এইতে কোন রকমে ওদের জীবন ধারণ হ'ত। ওর কাকা আর ছোট ভাইবোনেরা প্রায়ই ছত্তরে বা অন্নসত্রে খেয়ে আসত।

এখানকার কথা বলতে পারি না কিন্তু আমি যে সময়ের কথা বলছি, মানে আমার ছেলেবেলায়, কাশীতে ইস্কুল-কলেজের ছেলেরা দারিদ্র্যকে একটুও লজ্জা বা অপমানের কারণ বলে মনে করত না। সেই জন্যই সকলেই তাদের সাংসারিক অবস্থার কথা সহজভাবেই গল্প করত—কোন কথা বাড়িয়ে বা মিথ্যে করে বলা কিংবা সত্য গোপন করার প্রয়োজন হ'ত না কখনও। আমাদের ফণীরও তাই একমাত্র যে সখ ছিল তার কথা আমরা জানতুম। ওর জীবনের বোধ হয় সবচেয়ে উচ্চাশা ছিল কলকাতা শহর সে দেখবে। কলকাতার এত গল্প সকলের কাছে সে শুনত যে তার কল্পনায় কলকাতা ছাড়া আর কোন বড় শহরই ছিল না। এমন কি, তাকে কেউ লণ্ডন বা নিউইয়র্ক শহর দেখাতে চাইলেও অত উত্তেজিত হ'ত না। বরং আমার মনে হয় যে জিওগ্রাফীতে পড়া ঐ শহরগুলোকে সে একটু করুণার চোখেই দেখত। একমাত্র যে শহর লোকের দেখা উচিত, যে শহরের পৃথিবীতে তুলনা নেই—সে হ'ল কলকাতা। কোনমতে কলকাতা শহরটা একবার চোখে দেখে আসতে পারলেই তার জীবন সার্থক হয়ে যায়।

এই ব্যাপারে তার সবচেয়ে বড় মুরুব্বি ছিলাম আমি। তার অন্যসব সহপাঠীরা, কেউ হয়ত একবার কলকাতা দেখেছে, কেউ বা বার দুই। কিন্তু আমি খাস্ কলকাতার ছেলে,

সেইখানেই জন্মেছি, এখনও গরমের ছুটিতে প্রতি বছর কলকাতা যাই, সুতরাং তার শ্রদ্ধা ছিল আমার উপরই সবচেয়ে বেশী। সে অবসর পেলেই আমার বেঞ্চিতে এসে গা ঘেঁসে বসত এবং অনুরোধ করত, 'কলকাতার কথা একটু বল্না ভাই!' কলকাতায় কেমন করে ট্রাম চলে, বাস যায় শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট, কতগুলো বায়োস্কোপ আছে, হাওড়া ইষ্টিশন কত বড়, গঙ্গায় সেখানে কত বড় বড় জাহাজ চলে—এসব কথা বহুবার শুনেও তার তৃপ্তি হ'ত না। আমারও তখন বয়স অল্প, আমিও একটু বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতুম। যা দেখিনি আর যা দেখেছি, তার একটা অদ্ভুত মিশ্রণ হ'ত আমার গল্পে—আর সে বেচারা একান্ত তন্ময় হয়ে শুনত সেইসব গাল-গল্প। বিস্ময়ে তার চোখ ক্রমশঃ বিস্ফারিত হ'তে থাকত—এক এক সময়ে পলক পড়ত না চোখে।

কিন্তু এই আজব শহর কলকাতা যে ও কোনদিন চোখে দেখতে পারবে, সে আশা ছিল না ওর; তাই শুনতে শুন্তে শুধু ওর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ত। ওর বাবাই ছেলেবেলায় একবারমাত্র গিয়েছিলেন, যেন কার একটা সঙ্গে! এমন কোন ধনী আত্মীয়ও এখন ওর নেই যে ওকে বিনা খরচায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। সুতরাং কলকাতা ছিল ওর কাছে দুরাশা, সবচেয়ে অসম্ভব স্বপ্নের মধ্যে। আমরাও জানতুম এবং ফণীও জানত যে কলকাতা ওর জীবনে কোনদিনই দেখা হবে না।

ফণী তখন ক্লাস নাইনে উঠেছে। হঠাৎ ওর একটা সুযোগ মিলে গেল। ওদের পাড়ার কাছেই গণেশ মহল্লাতে এক

পেনশ্যনভোগী বৃদ্ধ ভদ্রলোক সপরিবারে এলেন। তাঁর নাতিটিকে পড়াতে হবে ; মাষ্টার চাই। কে একজন ফণীকে সন্ধান দিয়েছিল, ফণী গিয়ে দেখা করতেই তিনি রাজী হয়েছিলেন। নিতান্তই ফার্ষ্ট বুক পড়ে ছেলেটি, মাইনেও প্রায় সেই অনুপাতে ঠিক হ'ল মাসিক হু'টাকা—অর্থাৎ ফণীর মাসিক তু'টাকা নিজের আয় দাঁড়ালো। কিন্তু হ'লে কি হবে? এধারে ওর অন্যসব ভাইরাও ইস্কুলে পড়তে শুরু করেছে। তাদের জন্য ওর বাবার খরচা বেড়েছে ঢের কিন্তু মাইনে এতদিনে কুড়ি থেকে মাত্র তেইশে এসে পৌচেছে, ফলে ফণী যে বইগুলো চেয়েচিন্তে না পায় সেগুলো পড়াই হয় না ওর। কাগজ নেই, খাতা নেই, মহা অসুবিধা। ফণী এই টিউশানীটা পেয়ে বেঁচে গেল। পড়াশুনার জন্য যেগুলো একান্ত দরকার, তু'একটা করে ও তাই কিনতে সুরু করল। তাতেই ওর মাসিক তু'টাকা আয় কোন্ পথে অদৃশ্য হ'ত তা সে বুঝতেই পারত না।

তবু যে আশা, যে সংকল্প মানুষের অস্থিতে মজ্জাতে মিশে থাকে তা সফল করার চেষ্টা সে করেই—যে অবস্থাতেই থাক্ না কেন। ফণীও সেই অসম্ভব সম্ভব করার চেষ্টা করতে লাগল। ঐ তুটাকা আয় থেকেই সে পয়সা জমাতে লাগলো। কলকাতা যেতে আসতে প্রায় দশ টাকা ট্রেনভাড়া, সেখানে ধর্মশালায় থেকে সামান্য কিছু খেয়েও যদি সে চার-পাঁচদিন ধরে ঘুরে ঘুরে শহরটা দেখে, তাহলেও অন্ততঃ পাঁচ-ছ টাকা খরচ—সুতরাং কুড়ি টাকা যেমন করেই হোক ওকে জমাতেই হবে।

যাঁরা অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে তাঁরা বুঝতেই পারবেন না,

বিশেষত আজকের দিনে, সে কুড়ি টাকা জমাতে কত সময় লাগতে পারে! কিন্তু যাদের চারিদিকে অভাব, যাদের বিরাট সংসার চলে তেইশ টাকায়, তার মধ্যে ইস্কুল-কলেজের খরচাও কিছু কিছু জোগাতে হয়, তাদের পক্ষে চারিদিকের সহস্র অভাব থেকে বাঁচিয়ে উপবাসী ভাইবোনদের বঞ্চিত করে, নিজে অসংখ্য খাদ্য-সম্ভারের মধ্যে থেকেও ক্ষুধা চেপে রেখে একটিও আনি জমানো যে কত কঠিন কাজ, তা যারা অভাবের সংসারে মানুষ হয়েছে, তারা হয়ত কতকটা বুঝতে পারবে। ফণী সেই দুঃসাধ্য-সাধন ব্রতেই লেগে গেল প্রাণপণে। কী যুদ্ধটাই না করতে হ'ল ওকে দারিদ্র্যের সঙ্গে, প্রলোভনের সঙ্গে! একবার করে দু' এক টাকা জমে আবার একটা বৃহত্তর প্রয়োজনে হয়ত চলে যায়! এর মধ্যে পরীক্ষার ফি জমা দিতে হ'ল ওকে। আবার প্রবেশিকা দিয়ে কলেজে ভর্তি হতে হ'ল। মাইনে দেবার প্রয়োজন ছিল না বটে কিন্তু এগুলো ত আর রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়। ওর বাবা অবশ্য কোন বড়লোককে ধরে কিছু টাকা পেয়েছিলেন—তবু তাতে সব খরচা কুলোয়নি, পাঁচ টাকা ফণীকেও তার এত কষ্টের তহবিল থেকে বার করতে হয়েছিল। এইখানে একটা কথা বলে রাখি, কলেজের বই একখানাও কেনেনি ফণী, সহপাঠীদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আগাগোড়া খাতায় নকল করে নিয়েছিল।

যাই হোক, তবু তিন-চার বছরে একরকম করে কুড়ি টাকা জমল। ইতিমধ্যে ওর টিউশানীর মাইনেও বেড়েছিল কিছু, কলেজে ওঠবার পর বোধ হয় পুরো তিন টাকা করেই পাচ্ছিল।

সুতরাং এতদিনের স্বপ্ন সফল করবার জন্য উঠে পড়ে লাগল। সে কি ছুটোছুটি বেচারার! এর কাছে গিয়ে গাড়ীর সময় জানে, ওর কাছে গিয়ে রাস্তার নাম লিখে নেয়—ব্যস্ততার অন্ত নেই যেন! সব জেনে শুনে যোগাড়যন্ত্র করে নিয়ে যেদিন ও সত্য সত্যই যাত্রা করলে, সেদিন ওর মুখ দেখে মনে হ'ল যেন সাক্ষাৎ স্বর্গ নেমে এসে ওর হাতে ধরা দিচ্ছে, ও যাচ্ছে কলকাতা শহরে নয়, হয়ত বা চন্দ্রলোকেই!

স্টেশনে যখন পৌঁছল ফণী তখন ট্রেন এসে গিয়েছে, ছাড়বারও বিশেষ দেরী নেই। কোনমতে তাড়াতাড়ি টিকেট কিনে প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময় এক বাধা। একটি হিন্দুস্থানী বুড়ী প্রাণপণে তার প্রায় সতেরো আঠারো বছরের রুগ্ন ছেলেকে কোলে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে যাবে, টিকেট কলেক্টার ঢুকতে দেবে না তাকে কিছুতেই; বুড়ী হাউ হাউ করে কেঁদে চেঁচিয়ে হাট বাধিয়ে তুলেছে। ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করে ফণী জানল যে ওর এই ছেলে তিন-চার দিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, কী রোগ এখানকার ডাক্তাররা কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। কে একজন ডাক্তার বলেছেন যে কলকাতা মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে ওর চিকিৎসা হ'তে পারে। ওর হাতে এক পয়সাও নেই। ও চায় বিনা ভাড়াতেই ছেলেকে কলকাতায় নিয়ে যাবে। কিন্তু এরা তা যেতে দিচ্ছে না। বলতে বলতে বুড়ী আবারও হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, বুকফাটা কান্না। 'বাছাকে আর বুঝি বাঁচান গেল না, হা ভগবান!'

আশে পাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা নানারকমের সস্তা উপদেশ

দিচ্ছিলেন। কেউ বলছিলেন ওধারে লাইন ডিঙ্গিয়ে ঢোকগে যাও, কেউ বা বলছিলেন বিশ্বনাথের নাম করে ফেলে রাখতে, যা করবার তিনিই করবেন। কিন্তু ফণী এক মুহূর্তও ইতস্ততঃ করলে না, ছুটে গিয়ে টিকিট-ঘর থেকে আর একখানা টিকিট কিনে আনলে। তারপর সেই তু'খানা টিকিটের সঙ্গে বাকী টাকাটাও বুড়ীর হাতে গুঁজে দিয়ে বল্লে, 'যাও বুড়ী, তোমার বাচ্ছাকে দেখিয়ে এসো গে!'

তারপর বেশ প্রফুল্ল মুখেই পুঁটুলী এবং বিছানা বয়ে আবার বাড়ী ফিরে এলো।

এলিজাবেথের সাহস

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে যে, দুষ্ট গাইয়ের সঙ্গে কপিলা গাইও বদ্ধ হয়। এটা মানুষের কথাই বলা হয়, গরুর উপমা দিয়ে। সব দেশে সব কালেই এমন ঘটে।

ফরাসী দেশে বহুশত বৎসরের অত্যাচারের ফলে দরিদ্র জনসাধারণ যখন ক্ষেপে উঠেছিল তখন তাদের সে রোষবহ্নিতে শুধু দোষীরাই পুড়ে মরেনি, বহু নির্দোষ লোকও মরেছে। বন্যার জলের মত দেশ প্লাবিত করে যে বিদ্বেষের স্রোত বয়ে গেছে সেকি আর অত বিবেচনা করে চলতে পারে? রাজকর্মচারী, ধনী ও জমিদার—এই ছিল তাদের প্রতিহিংসার লক্ষ্য, কিন্তু তাদের সাহায্য করেছে এই সন্দেহে বহু দরিদ্র বা মধ্যবিত্তরাও প্রাণ দিয়েছে, বলতে গেলে বিনা বিচারে এবং বিনা বিবেচনাতেই। মানুষ যখন পাগল হয়ে উঠেছে, প্রতিটি লোকের কথা ভেবে দেখবার তখন সময় কোথা?

আজ যে মেয়েটির কথা বলছি, এলিজাবেথ কাজোৎ, তার বাবা ছিলেন সাহিত্যিক। শহর থেকে বহু দূরে এক নিভৃত পল্লীতে বসে সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ লিখতেন ও পড়তেন। অত্যন্ত শান্ত, নির্বিরোধ মানুষ ছিলেন, পৃথিবীর সমস্ত রকম অন্যায় অবিচার, দলাদলি ও বিবাদ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করতেন প্রাণপণে। দুনিয়ার খবরও বিশেষ রাখতেন না, বইতে যতটুকু পাওয়া যায় সেটুকু ছাড়া। বৃদ্ধ বয়সে অবলম্বন বলতে, সঙ্গী বলতে ছিল শুধু

ঐ ষোল বছরের মেয়ে এলিজাবেথ আর ছিল তাঁর বাগান ভরা ফুলের রাশি।

এলিজাবেথ বড় সুখেই ছিল। সমবয়সী সাথী কেউ ছিল না বলে সে দুঃখ-বোধ করত না। সরল বৃদ্ধ বাবা, তাঁর রাশি রাশি বই এবং চারিদিকে ফুলের সমারোহ, এরই মধ্যে তার দিন কেটে যেত একটা স্বপ্নের মত। এর চেয়ে বেশী কিছু তার প্রয়োজনও ছিল না।

বিপ্লবের আগুন যখন জ্বলে উঠল তখন সে সংবাদ এসে পৌঁছল ওদের কানে কোন দূর দেশের সংবাদের মত। তা নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় নি। বহু দূরের আকাশ-প্রান্তের মেঘ-গর্জনের মতই ছিল তা সুদূর, অন্যমনস্ক হয়ে শোনা যায়, হয়ত কোন অবসর সময়ে তা নিয়ে আলোচনা করাও যায়—কিন্তু তাতে ভয় পাবার কি আছে? এ বিবাদ যে দু'দলে হচ্ছে তাদের কোনটার মধ্যেই ত এরা পড়ে না।

কিন্তু তবু কী থেকে কি হ'ল—হঠাৎ জাতীয় সমিতির তরফ থেকে কতকগুলি লোক এসে বৃদ্ধ কবিকে গ্রেপ্তার করলে।

সে কি কথা? বৃদ্ধ অবাক—না, না, নিশ্চয়ই কোন ভুল হয়েছে।

কন্যা ব্যাকুল হয়ে উঠল, 'আপনারা বড্ড ভুল করেছেন। এঁর মত নিরীহ মানুষকে কখনই ধরতে বলেন নি কেউ—এই বুড়ো মানুষ, এঁকে মিছামিছি কেন কষ্ট দেবেন?'

যারা ধরতে এসেছিল, তারা শুধু গম্ভীর ভাবে বললে, 'বেশ ত ভুল হয়—বিচারে ছাড়া পাবে। কিন্তু আমাদের ওপর স্পষ্ট

নির্দেশ দেওয়া আছে—এই দেখ না, নাম লেখা রয়েছে পরোয়ানায়।'

অনেক কাকুতি-মিনতিতে যখন তাদের টলানো গেল না, তখন এলিজাবেথ বললে, 'আমি সঙ্গে যাবো তাহলে।'

বৃদ্ধ কবি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, 'না না মা, তুই কেন যাবি? তোকে যদি এরা কোন দুঃখ দেয় ত, তা যে শেলের মত বাজবে আমাকে—'

'সে হয় না বাবা! সেখানে তোমাকে দেখবে কে? তোমার সেবা করবে কে? তোমার চোখে চশমা থাকতে তুমি চশমা খুঁজে বেড়াও, খাবারের সামনে বসে খেতে ভুলে যাও—'

জাতীয় সমিতির সদস্যরা বললে, 'তোমার নামে ত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নেই, তোমায় কেন ধরব? সে আমরা পারব না।'

এলিজাবেথ দুহাতে ওর বাবাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'তা হলে আমার বাবাকেও নিয়ে যেতে পারবেন না আপনারা। হয় দুজনকেই নিয়ে যেতে হবে—নইলে আমাকে মেরে ফেলতে হবে আগে। আমি ছাড়ব না।'

ওরা দেখলো অত হাঙ্গামার দরকার কি? চলো হে চলো—দুটোকেই নিয়ে চলো। গিলোটিনের খোরাক যত বাড়ে ততই ভালো!

ওঁদের দুজনকেই ধরে নিয়ে গিয়ে সদরে জেলখানায় বন্ধ করে রাখলে।

তারপর কোথায় বা বিচার, কোথায় বা কি? ওদের দুঃখ-দুর্দশার সীমা নেই। একরত্তি কারাগারে অসংখ্য লোক,

নিয়মিত খেতেও দেয় না কেউ। নানা রকমের লোকের ভীড়ে অনাহারে অনিদ্রায় দিন কাটে। ওরা বন্ধই হয়ে রইল এই ভাবে! কর্তারা বোধহয় ভুলেই গেছেন ওদের কথা!

এইভাবে ন'দিন কাটবার পর হঠাৎ এক উন্মত্ত জনতা প্রচুর নেশা করে এসে হাজির। জেলখানার দোর খুলে ভেতরে ঢুকে ওর ভেতরেই এক বিচারসভা বসালো। বিচার-সভা ত কত, নিজেদেরই ভেতর থেকে কয়েকজনকে দেখিয়ে বলা হ'ল—এরাই তোমাদের বিচারক।

তারপর ঐসব কয়েদীদের একে একে হাজির করা হ'ল বিচারকদের সামনে। বিচারকরা খুব গম্ভীর হবার চেষ্টা ক'রে বললেন, 'বলো, তোমাদের কী বলবার আছে!'

যাদের হাজির করা হ'ল তাদের ত প্রাণের ভয়, তারা ভুলে গেল যে এর সবটাই প্রহসন, তারা প্রাণপণে নিজেদের নির্দোষিতা প্রমাণ করার চেষ্টা করতে লাগল। বিচারকরা নেশার ঘোরে কিছুক্ষণ চোখ বুজে তাদের যুক্তি শোনবার চেষ্টা করেন আর একটু পরে গম্ভীরভাবে বলেন, 'ও' তাইত বটে—এ ত দেখছি ভুলই হয়েছে। আচ্ছা এদের অন্য কারাগারে নিয়ে যাও।'

তারপর, বেচারী কয়েদীরা আপাতত অব্যাহতি পেল মনে করে যেমন বাইরে যাবার চেষ্টা করতে লাগল, বাইরের জনতার হাতে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এরা কে, কি এদের অধিকার, এই যে এরা নির্বিচারে হত্যা করছে তাই বা কোন্ সাহসে—এসব প্রশ্ন তখনকার দিনে ফ্রান্সে ছিল না। জনতাই সব, গায়ের জোরই বড় অধিকার।

কাজোতের পালা যখন এল তখন এলিজাবেথ করুণভাবে বিচারকদের কাছে বোঝাতে চেষ্টা করলো যে, ওর বাবা কত নির্দোষ, কত নিরীহ! কখনও অত্যাচারীদের কোন সাহায্য করেনি, কখনও হাত মিলোয়নি তাদের হাতে—বরং আশ্বাস দিয়েছে দেশের নিপীড়িত জনসাধারণকে—

খানিকটা পরে চোখ খুলে একজন বিচারক ঐ একই রায় দিলেন, 'ও তাইত, এটা ভুলই হয়েছে। আচ্ছা এদের অন্য কারাগারে পাঠিয়ে দাও। পরে একসঙ্গে তদন্ত হবে!'

ঐটেই ওদের কৌতুক, ওদের খেলা।

এলিজাবেথ অত জানে না। জানে, বাবাকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এই মাত্র। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে ব্যাপার বুঝতে পারলে। অসংখ্য দলিত বিকৃত শব চারিদিকে, মানুষের ওপর মানুষে কত নৃশংস হতে পারে তারই কাহিনী সর্বাঙ্গে নিয়ে পড়ে আছে তারা, যারা কিছুক্ষণ আগেও তার আশে-পাশে জীবনের আশা বহন করে চলেছিল প্রাণপণে!

ততক্ষণে উন্মত্ত রক্তপাগলের দল ধরেছে ওর বাবাকে। সত্তর বছরের অথর্ব বৃদ্ধকেও তারা রেহাই দিতে প্রস্তুত নয়।

চকিতের মধ্যে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে এলিজাবেথ পাগলের মত সবাইকে ঠেলে সরিয়ে কাছে গিয়ে বাবাকে নিজের দেহ দিয়ে ঢেকে দাঁড়াল—'খবরদার, আমাকে না মেরে আমার বাবার গায়ে হাত দিতে পারবে না কেউ!'

ঐটুকু একফোঁটা মেয়ের সিংহিনীর মত মূর্তি দেখে সবাই

বিস্মিত, হতচকিত ! তাদের এমনি নেশা ও রক্তের নেশা দুই-ই যেন ছুটে গেল খানিকটা করে !

তখন এধারেও যেন সরস্বতী ভর করেছেন এলিজাবেথের

রসনায়, সে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করে বলছে, 'এ কী করছ তোমরা? রক্তের নেশায় পাগল হয়ে এ কী করতে বসেছ? নিরপরাধ অসহায় বৃদ্ধ তোমাদের কল্যাণ ছাড়া কখনও অকল্যাণ করেন নি—একে এমন ভাবে হত্যা করলে সে পাপ কোথায় রাখবে? তোমাদের স্বাধীনতাই ভেঙ্গে চূরমার হয়ে যাবে যে সেই পাপে—?

আরও কত কি! সে বক্তৃতার ফলে চারিদিকে কোলাহল উঠল, 'ছেড়ে দাও! যেতে দাও ওদের!'

কী হ'ল সে জনতার মনে কে জানে! সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত সরে দাঁড়ালো, এলিজাবেথ তার বাবাকে নিয়ে নিরাপদে বেরিয়ে গেল সেই সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবল থেকে! ষোল বছরের মেয়ে তিন-চারশ' হিংস্র লোকের হাত থেকে তাদের শিকার ছিনিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলো।

অজন্তার আত্মা

অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি বললে ভুল বলা হয়। ঘোড়ার নালের মত পাহাড়টি বেঁকে গেছে, তারই গায়ে সার সার উনত্রিশটি গুহা! কোনটা একটু ওপরে, কোনটা নীচে। গুহাগুলোর সামনে দিয়ে যে সরকারী পথটি তৈরী করা হয়েছে, সেটিও কোথাও সিঁড়ি হয়ে নেমে গেছে, কোথাও বা উঠেছে। আর এই অশ্ব-ক্ষুরাকৃতি পাহাড়ের মুখটি সম্পূর্ণ আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি পাহাড়। খুঁজে খুঁজে এই স্থানটিই বৌদ্ধভিক্ষুকরা বেছে নিয়েছিলেন—যাতে বাইরের কোথাও থেকে তাঁদের এই উপাসনার জায়গাটি নজরে না পড়ে! একেবারে ছুটো পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে না পড়লে কিংবা সামনের পাহাড়ের ওপরে না উঠলে এর অস্তিত্বই টের পাবার উপায় নেই। আর হয়েছিলও তাই—মুসলমান আমলে একেবারেই জায়গাটা জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছিল, ওর খবরও কেউ জানত না। মাত্র পঁচাত্তর বছর আগে, এক সাহেব সামনের পাহাড়ে শিকার করতে এসে হরিণের পিছু পিছু একেবারে সবচেয়ে উঁচু শিখরটায় উঠে পড়েন এবং হঠাৎ দেখতে পান গভীর জঙ্গলে ঢাকা এই পাহাড়টার গায়ে সার সার গুহাগুলি প্রেতাবাসের মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে! তারপর অবশ্য ভারত-সরকার ওঁর হাতেই ভার দেন এগুলিকে পরিষ্কার করে রক্ষা করার এবং এ-সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করার। ক্রমশ এর সংবাদও দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল—কত শিল্পী চেষ্টা করলে এর ভেতরে দেওয়ালে আঁকা

ছবিগুলোকে নতুন করে রূপ দিতে—কত শিল্পী এর থেকে প্রেরণা পেয়ে বিখ্যাত হ'ল। গবর্ণমেণ্টের বহু অর্থ এগুলিকে রক্ষা করতে ব্যয় হ'ল—আজও হচ্ছে। বাস্তুকর্মীদের যত্নের ত্রুটি নেই এর বর্তমান অস্তিত্বটুকুকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে।

জায়গাটি কিন্তু বেশ। হায়দ্রাবাদ-অঞ্চলের উঁচু-নীচু রুক্ষ জমি, মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে আমাদের বাস্ ছুটে এল। কোথাও কোথাও তা দুদিকেই দিগন্তবিস্তৃত—লোকালয় বা চাষবাসের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। গাছপালা বলতে শুধু মধ্যে মধ্যে কাঁটাগাছ। সবটা জড়িয়ে কেমন একটা ছবির মত দেখায়! এরই ভেতরে এই পাহাড়-দুটি, বোধ হয় সাতপুরা পর্বতমালারই একটা শাখার প্রান্তে নির্জনে দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষাকৃত এই পাহাড়-দুটিই একটু শ্যামল, অজন্তা গুহাগুলির কোল বেয়ে একটি ঝরণাও নেমে এসেছে, বারোমাসই তাতে জল থাকে। লোকচক্ষুর আড়ালে, জনহীন এই পর্বতগুহা, তপস্যা করারই উপযুক্ত স্থান বটে।

এ গুহাগুলো কিন্তু স্বাভাবিক নয়—মানুষের কাটা। সবগুলো এক সঙ্গেও কাটা হয়নি—ন-শ' বছর ধরে বলতে গেলে এর নির্মাণ-কার্য চলেছে। যার যখন ইচ্ছা ও সুবিধা হয়েছে, সে তখন একটা গুহা কাটিয়েছে। এর ভেতর, ঐতিহাসিকরা বলেন, ন' নম্বর গুহাটিই নাকি সবচেয়ে পুরানো। খ্রীষ্টের জন্মাবারও প্রায় দু'শ বছর আগে এর নির্মাণ শুরু হয়। এর কোন-কোনটাতে বুদ্ধদেবের দেহচিহ্ন অবলম্বন করে চৈত্য বা ছোট ছোট স্তূপ তৈরী করা হয়েছে, এসব গুহাতেই বোধ হয় তখন

পূজা-উপাসনা চলত। সব গুহা এক রকম নয়—কোনটা বড়, কোনটা ছোট। সবগুলোতে ছবিও নেই। অবশ্য যত ছবি আঁকা হয়েছিল, তার খুব কম অংশেরই আজ অস্তিত্ব আছে, তবু কতকগুলোতে যে মোটে আঁকবার চেষ্টা করাই হয়নি তা বেশ বোঝা যায়। এর ভেতর আবার কোন-কোনটাতে কিছু ক্ষোদাই-এর কাজ আছে, কোনটা বা শুধু মসৃণ সাধারণ পাথরের দেওয়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এই শেষের শ্রেণীর গুহাগুলো, বেশ বোঝা যায় যে, অধিকাংশই তৈরী হয়েছিল শুধু প্রয়োজনে, অর্থাৎ ভিক্ষুদের ও ছাত্রদের থাকবার কিংবা পড়বার স্থান দিতে। থাকবার ব্যারাক যেগুলো, সেগুলো ভারি মজার, ছোট ছোট নীচু পাথরেরই খোপ-মত ঘর (পাহাড় কেটে বার করা—গাঁথা নয়—তা বলাই বাহুল্য), তাতে সামনা-সামনি দরজার তু-পাশে তুটো পাথরেরই শোবার বেদী। পাশে একটি করে কুলুঙ্গি কাটা, বোধ হয় পুঁথি রাখবার জন্য। আর বেদীর একদিকে একটা করে পাথরের বালিশ। বেদীটাই এমন ভাবে ক্ষোদা হয়েছে যে, সেখানটা বালিশের মত সামান্য উঁচু হয়ে আছে। কোন বিলাস বা আরামের ব্যবস্থা ছিল না। ছাত্র ও ভিক্ষুদের সেই পাথরের শয্যাতে পাথরের ওপর মাথা দিয়েই শুতে হত। মৃগচর্ম বা ব্যাঘ্রচর্ম পেতে শুতেন কিনা জানি না, তবে বালিশ যে জুট্‌ত না, তা ঐ পাথরের বালিশ দেখলেই বোঝা যায়। এইসব ঘরের একটা করে দোরও ছিল—তার চিহ্ন আছে, তবে কপাট নেই।

সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত, তার ওপর আমার সঙ্গীদের

মত ঠিক অত দ্রুত দেখতেও পারি না—সুতরাং আমি একটু পেছিয়েই পড়েছিলাম। তা-ছাড়া, শুধু ছবি দেখার জন্য আমি আসিনি—ছবিওলা গুহার চেয়ে এই বসবাসের গুহাগুলোতে আমার কম কৌতূহল নেই। অথচ এগুলো সাধারণ দর্শকরা এড়িয়েই যান। আমি সেই নির্জন নিস্তব্ধ পাথরের বিরাট গুহার মধ্যেকার এই খুপ্‌রি-কাটা ঘরের কঠিন অনাড়ম্বর দেওয়ালগুলোর মধ্যে বহুশত বৎসর আগেকার এই ঘরগুলির অধিবাসীদেরও পরিচয় পাবার চেষ্টা করি! এর কোথাও কোন ইতিহাস লেখা নেই, তবু এরই ভেতর তারা বাস করেছে—বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী! কত লোক, কত রকমের লোক! কেউ হয়ত ঐ সব কুলুঙ্গীতে পুঁথি রাখত, কেউ রাখত পেড়ে-আনা বন্য ফল কিংবা বিহারের মহোৎসব থেকে বাঁচানো অথবা চুরি-করে-আনা পিষ্টক কি মিষ্টান্ন! কেউ বা তাদের মধ্যে ছিল আমুদে, কেউ বা বদ্‌-মেজাজী! কেউ ভুগত আমাশায়, কেউ বা হাঁপানী রোগে। কোন ছাত্রকে হয়ত পড়া শেষ করার আগেই মলিন মুখে বিদায় নিতে হয়েছে! কেউ বা দু'হাত ভরে আচার্য ও স্থবিরদের আশীর্বাদ এবং প্রশংসা নিয়ে উজ্জ্বল মুখে বাড়ী ফিরে গেছে। কোন ভিক্ষু সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, সন্ন্যাসী হয়েছেন, মহাস্থবির হয়েছেন, কাউকে হয়ত কোন অপরাধে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে! এমনি কত এলোমেলো কথা মনে হয় আমার এই পাথরের ঘরগুলিতে ঘুরতে ঘুরতে! কেমন লোক ছিল তারা, কে জানে? কী ভাষায় কথা কইত, কা খেত? কোন ইতিহাসে কোথাও লেখা নেই আজ সত্য কথা কিন্তু এই পাষাণ-

প্রাচীর, এই শয়নের বেদীগুলো যদি কথা কইতে পারত, তাহ'লে কত গল্পই শুনতে পেতাম, কত বিচিত্র বিবরণ নানাবর্ণের বিচিত্র মানুষের!

ঘুরতে ঘুরতে পরিশ্রান্ত হয়ে একটা খুপ্‌রিতে বসে ওই সব কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ মনে হ'ল এই বিছানায় কতদিন কত লোক শুয়েছে—আমিও শুয়ে যাই। দেখা যাক্ পাথরের বালিশে মাথা দিয়ে শুতে কেমন লাগে! সটান্ লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম সেই পাথরের ওপরই। ধূলো বিশেষ নেই, অত উঁচুতে বোধ হয় ধূলো ওড়ে না। পাথরের বালিশগুলি বেশ মাথার মাপ-মতই তৈরি, সুতরাং খুব কষ্ট হ'ল না। ক্লান্তির পর বিশ্রাম এবং ঠাণ্ডা বাতাস পেয়ে বরং দুই চোখ যেন বুজেই আস্‌তে লাগল! তবু ঘুমোলুম না, শুয়ে শুয়ে এই কথাটাই ভাবতে লাগলুম, এমন করে এত দীর্ঘকাল এই গুহাগুলো সম্পূর্ণরূপে মানব-দৃষ্টির অগোচরে রইল কী করে?

ভাবতে ভাবতে বোধ হয় একটু তন্দ্রাও এসেছিল, হঠাৎ যেন কার একটা নিঃশ্বাসের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল!

চম্‌কে চেয়ে দেখি আমার বেদীটার ঠিক পাশের বেদীতে, মাত্র হাত-খানেক দূরে এক ন্যাড়া-মাথা, হলদে কাপড়-পরা বৌদ্ধ ভিক্ষু কখন এসে বসেছেন! আশ্চর্য! আমি কি এতই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম?

ভিক্ষু একটু হেসে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'আমার পায়ের আওয়াজ পাওয়া সম্ভব নয়—তাই শুনতে পাননি।'

আরও অবাক হয়ে গেলাম। কালো রং, ঠোঁট পুরু—এদেশের

অধিবাসীদের সঙ্গেই চেহারার মিল বেশী। আমি ত দক্ষিণী বলেই মনে করেছিলাম! প্রশ্ন করলাম, 'আপনি কি বাঙ্গালী?'

'না। আমি তামিলী কিন্তু আমি এখন যেখানে থাকি সেখানে সব ভাষাই আপনা-আপনি আয়ত্ত হয়।'

'সে আবার কোন্ দেশ?' মনে মনে ভাবি।

ভিক্ষুই উত্তর দেন, 'যে দেশে জাতি-বিচার নেই, ধর্ম নেই—দেশের কোন গণ্ডী টানা নেই; অর্থাৎ আমি এখন পরলোকে আছি।'

ভয়ে গা-টা শির শির করে ওঠে। কোনমতে প্রশ্ন করি, 'তবে কি আপনি ভূত?'

'ছি! ভূত বলে কিছু নেই। আমি হচ্ছি এখানকার শেষ সঙ্ঘাচার্য বা মহাধ্যক্ষ, ভিক্ষু জ্ঞানশ্রীর আত্মা। আমিই এখানকার শেষ অধিবাসী। আপনি যা ভাবছিলেন তার উত্তর দেব বলেই আপনাকে দেখা দিলাম; নইলে আমি দৃষ্টি ও স্পর্শের অতীত, আমার সতি-সত্যিই কোন রূপ বা অস্তিত্ব নেই।'

সমস্ত দেহটা যেন কী একটা ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আছে, তবু পালাতে পারি না। এত কাছে ভিক্ষু বসে রয়েছেন, পালাব কি করে?

ভিক্ষু বললেন, 'সমস্ত ইতিহাসই একে একে ধরা পড়ল; যা আজও পড়েনি তাও একদিন হয় ত পড়বে কিন্তু আমার কথা জানবার আর কোন উপায় নেই যে! তার না আছে কোন সাক্ষী, আর না আছে কোন প্রমাণ। সেই জন্যই আজ আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি, আমার এই কথাগুলো আপনি লিপিবদ্ধ করে রেখে যাবেন।

পৃথিবীকে জানিয়ে দেবেন, আমার আচার্য ও গুরুদেব যে কঠিন দায়িত্ব আমার ওপর চাপিয়ে রেখে গিয়েছিলেন, আমি প্রাণপণে তা বহন করেছি। অমানুষিক সে কাজ। তবু করেছি।'

এতক্ষণে যেন জিভে একটু জল ফিরে এসেছে! তবু ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করি, 'কী সে কাজ?'

'বলছি। তাই বলতেই এসেছি। এত যে অসাধ্যসাধন করলাম, তার কোন ইতিহাস কোথাও থাকবে না—এ কেমন করে সইব?'

একটু বিদ্রূপ করে বললাম, 'আপনাদেরও তাহলে বিজ্ঞাপনের লোভ আছে?'

তিনি ভ্রূ কুঁচকে জবাব দিলেন, 'এটা বিজ্ঞাপন নয়, আত্মপ্রচারও নয়—ইতিহাস। ভারতের পুরাকাহিনীতে এতবড় একটা অধ্যায় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে আমি না বললে এ কথাগুলো। মন দিয়ে শুনুন!'

তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আমি যখন প্রথম শিক্ষার্থী হয়ে এখানে আসি, তখন এই ঘরে, ঐ যে শিলাসনে আপনি শুয়ে আছেন, ঐ শিলাসনেই আমার স্থান হয়েছিল। এটি তাই আমার বড় প্রিয়। মধ্যে মধ্যে নির্জন গুহাগুলোয় ঘুরতে ঘুরতে তাই এখানে এসে বসি।

সে আজ প্রায় হাজার বছর আগেকার কথা। বৌদ্ধধর্মের আর কোন প্রভাবই নেই কোথাও। ভারতবর্ষ থেকে তা লোপ পেতে বসেছে। এতবড় বিহারে তখন গুটি পাঁচ-সাত মাত্র শিক্ষার্থী ও ভিক্ষু এসে ঠেকেছে। আমিই এখানকার শেষ শিক্ষার্থী। কেউ

আসত না, আর কেউ আসেও নি। বরং আমি আসতেই বৃদ্ধ স্থবিররা বিস্মিত হয়েছিলেন।

আগে আগে রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ কিংবা বৌদ্ধদের অনুগত, সুতরাং পয়সার অভাব ছিল না ; কিন্তু আমার আমলে কোন রাজকীয় সাহায্যই আর বৌদ্ধ বিহাররা পেত না। বিক্রমশীলা, নালন্দা তখন লোপ পেয়েছে, সারনাথ মাটির তলায় অর্ধেক ঢাকা পড়ে গেছে। আমাদের এখানেও শোচনীয় অবস্থা। পুরাতন সঞ্চয় যা সামান্য ছিল মঠের কোষাগারে, তা থেকে কোনমতে পাঁচ-সাতটি লোকের চলত। শীতকালে তবু দূরবর্তী গ্রামে ভিক্ষায় যেতাম, তাও তারা বিশেষ ভিক্ষা দিতে চাইত না। হলদে কাপড় দেখলেই বিরক্ত হ'ত। বর্ষাকালটা সম্পূর্ণভাবে বন্য ফল ও কন্দ খেয়ে কাটাতে হ'ত।

এইভাবে আরও কিছুদিন কাটল। অপর যারা শিক্ষার্থী, তারাও চলে গেল ; কেউ বা এ পথ ছেড়েই দিল। দু-একজন সন্ন্যাসী যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও দেহ রাখলেন। এতবড় বিশাল বিহার যা একদা লোকের ভীড়ে সর্বদা উত্তপ্ত থাকত, সেখানে এসে ঠেক্‌লাম শুধু সঙ্ঘাচার্য শীলভদ্র ও আমি! আমি প্রথমে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র শিখতে এসেছিলাম সত্যকথা। আত্মীয়-বান্ধবরা অনেক নিষেধ করেছিলেন, বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, যে এদেশ থেকে যে ধর্ম লোপ পেয়ে যাচ্ছে তার শাস্ত্র অনুশীলনে প্রয়োজন নেই—কিন্তু কারু কথাই তখন শুনিনি। তবে এখানে কিছুদিন থাকবার পর সে আগ্রহ আমার তত ছিল না, শুধু আচার্য শীলভদ্রের মায়া কাটিয়ে আর বিদায় নিতে পারি নি। অসহায়

বৃদ্ধ আচার্য একা এই বিশাল মৃত্যুপুরীর মধ্যে কী করে থাকবেন আমি চলে গেলে? অথচ ওঁর নিষ্ঠা অসাধারণ, যদি কেউ না থাকে তবু তিনি এই বিহার ছেড়ে আর কোথাও যাবেন না। একটি মাত্র বিশ্বাসের শিখা অনির্বাণ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন তিনি, কোন দুর্দিনের ঝড়েই সে প্রদীপ নেভা সম্ভব নয়।

সুতরাং আমিও থেকে গেলাম। আমিই আহার্যের সংস্থান করি, সকালে ফুল এবং সন্ধ্যায় প্রদীপ সাজিয়ে দিই চৈত্য-পাদমূলে। আর রাত্রে গুরুর পদ-সেবা করতে করতে অন্ধকারে বসে তাঁর উপদেশ ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনি। বেশী আলো জ্বালাবার মত তেল ছিল না। ভাগ্যিস্ এর অনেকগুলো গুহাই তখন অব্যবহার্য হয়ে জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছিল! নইলে ভয়ে টিকতে পারতুম না নিশ্চয়ই!

ইতিমধ্যে শীলভদ্র খুবই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন—মহাস্থবির বিশেষণটি দিন দিন সত্য হয়ে আসছিল। ক্রমে এমন অবস্থা হ'ল যে, তিনি নিজেও বুঝতে পারলেন যে আর বেশী দিন তিনি ইহলোকে নেই। আমি ত' সত্য কথা বলতে কি, তাঁর মৃত্যুর দিন গুণছিলাম, তিনি দেহ রাখলেই আমিও এই নির্জন পর্বত-গুহা ত্যাগ করব! আমার সাধনা তখনও এমন স্তরে পৌঁছয়নি যাতে এই নির্জন পাহাড়ে একা বসে তপস্যা করি।

শীলভদ্রও বোধহয় আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি হঠাৎ একদিন আমার সমস্ত কল্পনা উল্‌টে দিলেন। বুদ্ধ-পূর্ণিমার দিন সকালে সহসা আমাকে বললেন, "বৎস, আমাকে মহাচৈত্যে নিয়ে চলো, আমি শেষ পূজা সেরে যাই।"

তখন তিনি চলৎশক্তি-হীন, কেমন করে অতটা যাবেন ? ভয় হচ্ছিল যে, বোধহয় তাঁকে নাড়তে গেলেই মারা যাবেন ! কিন্তু তিনি কোন কথাই শুনলেন না, জিদ্ করতে লাগলেন। অগত্যা তাঁকে, বলতে গেলে টান্তে টান্তে নিয়ে এলাম তাঁর বাসস্থান থেকে ওপরের ঐ মহাচৈত্যে। বুড়োর জান অসম্ভব শক্ত ! নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল মাঝে মাঝে, চোখ ঠেলে বেরোবার উপক্রম হ'ল—তবু তিনি নিবৃত্ত হলেন না। আমি প্রতিমুহূর্তেই ভয় করছিলাম যে এই বুঝি গুরুহত্যার জন্য দায়ী হতে হয় ! কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিরাপদেই পৌঁছলেন।

তখন আর স্নানের অবস্থা ছিল না। ঝরণার জল ছিটিয়ে দিলাম তাঁর মাথায়, ফুল-চন্দন সব হাতের কাছে গুছিয়ে দিলাম। তিনি প্রায় অস্ফুটকণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। তাঁর কম্পিত শিথিল হাত ফুল ধরতে পারে না— আমিই তাঁর হাতে ফুল দিয়ে হাত এগিয়ে দিলাম বেদীর দিকে।

এই ভাবে পূজা শেষ করে সহসা তিনি বললেন, "বৎস শোন, আমার একটি শেষ কর্তব্য বাকী আছে। সেটি পালন করব এবার।"

—"আদেশ করুন।" বললাম সবিনয়ে।

তিনি ইঙ্গিতে আমার মাথা তাঁর হাতের কাছে নিয়ে যেতে বললেন। আমি মাথা নোয়ালাম। তিনি তাঁর তুষার-শীতল ডান হাতটি কোনমতে আমার মাথায় রেখে বললেন, "আমি শীলভদ্র, এই বিহারের শেষ সঙ্ঘাচার্য ও মহাস্থবির, তোমাকে আমার উত্তরাধিকারী ও ভাবী সঙ্ঘাচার্য নিয়োগ করলাম। আজ

থেকে এই বিহার ও চৈত্যের ভার তোমার। যদি কখনও কোন শিক্ষার্থী কি ভিক্ষু আসে, তুমি গুরুর কর্তব্য পালন করবে—এই চৈত্য ও প্রভু অমিতাভের এই পূজার স্থানকে রক্ষা করবে প্রাণপণে। এই তোমার প্রতি আমার শেষ আদেশ।”

আমি যেন হাঁপিয়ে উঠে, প্রায় চীৎকার করে বললাম, “এ কী করলেন গুরুদেব ? এ সঙ্ঘে আর লোক কোথায় ? আমি কার ওপর গুরুত্ব করব ? তা ছাড়া আমার ভিক্ষু-ব্রত গ্রহণের অবসর দিলেন না যে, আমি কী করে এ-পদ গ্রহণ করব ?”

—“সে আমি বুঝব বৎস! আমিই যখন মনোনয়নের একমাত্র অধিকারী বর্তমানে—তখন সে দায়িত্ব আমার। তুমি এই চৈত্য স্পর্শ করে শপথ করো যে এ-দায়িত্ব তুমি বহন করবে প্রাণপণে ? বলো, বলো—আমার আর সময় নেই।”

অগত্যা তাই বলতে হ’ল। আর সময় ছিল না সত্যিই ; কারণ, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুরুদেব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। আমি ভেবে দেখবারও অবসর পেলাম না—‘না’ বলতেও বড্ড মায়া হ’ল।

কিন্তু কোনমতে গুরুদেবকে সমাধিস্থ করে যখন একটু বিশ্রামের অবসর পেলাম তখন আমার শপথের পূর্ণ গুরুত্বটা বুঝতে পারলাম। স্বার্থপর গুরুদেব এ কী করে রেখে গেলেন আমাকে ? জীবন্মৃত হয়ে রইলাম! এই বিশাল দুটি পাহাড়ে বাইরের জগৎ ও সংসার যেখানে একবারে আবরিত করে রেখেছে, সেইখানে লোক-চক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে এই বিশাল শূন্য গুহাগুলির মধ্যে একা একা প্রেতের মত ঘুরে বেড়াতে হবে আমাকে ?

দিনের পর দিন হয়ত বা বাইরের জগৎ এর অস্তিত্বই ভুলে গেছে! তারা কোনদিনই হয়ত কল্পনাও করবে না যে এর ভেতর কোন মানুষ আছে!

যতই কথাটা ভাবতে লাগলাম ততই যেন দম বন্ধ হয়ে এল! চীৎকার করে কেঁদে উঠলাম একবার কিন্তু সে কান্নার শব্দ চারিদিকের শূন্যতায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এসে আমাকে স্তব্ধ করে দিলে! অথচ উপায়ও নেই, মৃত গুরু এবং চৈত্য স্পর্শ করে শপথ করেছি, প্রাণপণে এই বিহারের রক্ষণাবেক্ষণ করব—সে শপথ ভাঙবার সাধ্য আমার ছিল না।

সুতরাং এমনি করেই দিন কাটতে লাগল—এই প্রহরীহীন ও কপাটহীন নির্জন কারাগারে আমি একা। একা একাই ভূতের মত নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াই। পুঁথিগুলো উল্টে দেখি, নয়ত নিজেও কিছু লেখবার চেষ্টা করি! আমার তখনকার দৈনন্দিন জীবনের একটা ইতিহাস বা অভিজ্ঞতা যা বলেন, লিখবারও চেষ্টা করেছিলাম! কিন্তু এখানকার অসংখ্য পুঁথির সঙ্গে তাও নষ্ট হয়ে গেছে।

এইভাবেই কাটে—দিন, মাস, বৎসর, যুগ! আগে তবু দু-একদিন ভিক্ষায় বেরোতাম, ইদানীং আর তাও ইচ্ছা করে না। একা মানুষ—কার জন্য ভিক্ষা করব? বাদামের তেল তৈরি করি, তাতেই আলো জ্বলে আর ফলমূল খাই। হঠাৎ প্রায় তিন বৎসর একাদিক্রমে এইখানে বন্ধ হয়ে থাকবার পর অত্যন্ত বস্ত্রাভাব হওয়ায় একদিন ভিক্ষায় বার হলাম। পথ-ঘাট অপরিষ্কার, প্রায় রুদ্ধ—তবু যাওয়া যায়। কিন্তু অত কষ্ট করে

লোকালয়ে গিয়ে চম্‌কে উঠলাম। সর্বত্র একটা ভয়ের ভাব, সর্বত্র আতঙ্ক! ব্যাপার কি? অনেক চেষ্টার পর শুনলাম, একদল বিদেশী ও বিধর্মী দস্যু, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের পার্বত্য পথ বেয়ে এসেছে ভারতবর্ষের সর্বস্ব লুঠ করতে। দেবস্থান ও মঠ বা বিহারের ওপর তাদের বেশী ঝোঁক। সোমনাথের মন্দির ভেঙে নিশ্চিহ্ন করেছে, মালবের স্বপ্ন-বাসুদেবের মন্দিরের অস্তিত্ব নেই! দু-একটি বৌদ্ধ বিহার বা চৈত্য যা তাদের পথে পড়েছে, তারা কেউই রক্ষা পায়নি। সেই দুর্বার দস্যুদল নাকি এবার দাক্ষিণাত্যের দিকে এগোচ্ছে!

ভয় পেয়ে এখানে ফিরে এলাম। তখন সঠিক সংবাদ জানবার কোন উপায় ছিল না; কিন্তু এদের দেখে মনে হ'ল শত্রু নিকটে এসেছে।

এখন কী করি? কি করে এই চৈত্যকে রক্ষা করি? আমি যে শপথ করেছি প্রাণপণে এই চৈত্য-বিহারকে রক্ষা করব! যদিও তখন গুরুদেবের মনে এরকম সম্ভাবনা জাগেনি, তিনি সাধারণভাবেই রক্ষা করার কথা বলেছেন, পূজা-অর্চনা ঐতিহ্য রক্ষা করার কথাই হয়ত তাঁর মনে ছিল, তবু শব্দের অর্থ তাতে বদলায় না।

ভেবে যেন কূল-কিনারা পেলাম না! একে ত একা—তার ওপর লোক ডাকতে গেলেও কেউ আসবে এমন সম্ভাবনা নেই।

তিন-চার দিন ধরে অনবরত ভাবতে ভাবতে অবশেষে একটা চিন্তা আমার মাথায় এল। একজন মানুষের পক্ষে তা দুঃসাধ্য, তবু তা-ছাড়া আর পথ ছিল না।

দুটি পাহাড়ের মধ্যে যে বিস্তৃত সমতল পথ—তার চিহ্ন পর্যন্ত লোপ করতে হবে, এখানকার অস্তিত্ব না টের পায় কেউ!

ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হ'ল সেই দুঃসাধ্য-সাধন ব্রত। একটি একটি করে ছোট গাছ বেছে নিই, তারপর চার-পাঁচদিনের চেষ্টায় চার পাশের মাটি খুঁড়ে গোড়াসুদ্ধ তাকে টেনে নিয়ে যাই ঐখানে। আগেই গর্ত খোঁড়া থাকে, সেখানে পুঁতে দিই আবার। গাছ যত ছোটই হোক, তার ওজন ত কম নয়, টানতে পারি না, তবু একটু একটু করে, এক এক চুল করে, নিয়ে যাই।

নড়ানোই এক-এক সময় অসম্ভব মনে হ'ত, তবু হাল ছাড়িনি। একটি গাছ কেটে নিয়ে গিয়ে পুঁততে সময় লাগত ছ'দিন থেকে সাতদিন। এইভাবে এই সমস্ত পথটা জঙ্গলে ভরিয়ে দিলাম; যা ছিল প্রান্তর, তা হয়ে গেল বন। সমস্ত পথটিকে জঙ্গলে ঢেকে নিশ্চিহ্ন করতে সময় লেগেছিল আমার ন' মাস। বসন্তে শুরু করেছিলাম, শরতে শেষ হ'ল।

এইভাবে লোকালয়ের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমার মুক্তির সমস্ত সম্ভাবনা লোপ করে, নিজের পলায়নের পথ নিজেই রুদ্ধ করে স্বেচ্ছাকৃত কারাগারে যখন আবার ফিরে এসে বিশ্রামের নিঃশ্বাস ফেললাম, তখন আমার শরীরও ভেঙ্গে এসেছে। ঝড় জল রৌদ্র সব সহ্য করে পরিশ্রম করেছি দৈনিক তিন প্রহর থেকে চার প্রহর পর্যন্ত। তার ফল কি আর ফলবে না? মানুষের যা সাধ্য তার চেয়েও বেশী করেছি। আজ অবধি কোন একজন মানুষ বোধহয় এতটা কাজ করতে পারেনি!

ক্রমে আমার জীবন-দীপও নিভে এল। হামাগুড়ি দিয়ে এসে একদিন ঐ চৈত্যের পাদমূলে আমারও শেষ পূজা সাঙ্গ করলাম। তারপর গুরু এবং ভগবান অমিতাভকে স্মরণ করে শুয়ে পড়লাম ঐখানেই। বন্যজন্তু যদি আমার মৃতদেহ জঙ্গলে টেনে নিয়ে না যেত, তাহলে সে অস্থি বোধহয় ঐতিহাসিকরা ঐখানেই খুঁজে পেতেন। আজও ঐ পাহাড়ের নুড়ি সরিয়ে খুঁজলে দু-একটা টুকরো মিলবে শিলীভূত অবস্থায়।'

দীর্ঘ কাহিনী শেষ করে ভিক্ষু থামলেন। আমি নির্বাক বসেছিলাম এতক্ষণ, এখনও কী বলব ভেবে না পেয়ে বললাম, 'তারপর ?'

'তারপর আর কি ? এই ইতিহাস লিখে রাখতে চেয়েছিলাম, থাকেনি। তাই আপনাকে বলে গেলাম, যদি বিশ্বাস হয়ত লিপিবদ্ধ করবেন—প্রচার করবেন। আপনি ত লিখেও থাকেন মধ্যে মধ্যে। আপনার আগে আর কেউ এখানকার অধিবাসীদের নিয়ে মাথা ঘামায়নি। আপনাকে আমাদের কথা চিন্তা করতে দেখেই আজ আপনার কাছে ধরা দিলাম।'

হঠাৎ বাইরে কোথা থেকে বিভূতিবাবুর গলা শোনা গেল, 'কৈ কোথা গেলেন ? ঘুমোচ্ছেন নাকি ?'

ধড়মড় করে উঠে বসি। ভিক্ষু কোথায় ? কারুর চিহ্নও নেই—পাশের বেদী শূন্য ! হয়ত স্বপ্নই দেখেছি এতক্ষণ ! তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়াই।

তাঁতিয়া টোপীর ফাঁসি

গল্পটা আমি শুনেছিলুম মদন মুখুয্যের কাছে। মদন মুখুয্যে কাশীতে আমাদের বাড়ীর দোতলায় ভাড়া থাকতেন। তাঁর তখন বাহাত্তর বছর বয়স, বছর পনেরো আগে পেন্‌সন নিয়ে কাশীবাস করতে এসেছিলেন। মদন জ্যাঠামশাই এ গল্প আবার শুনেছিলেন তাঁর বাবার মুখে, তাঁর বাবা মিউটিনীর সময় মাউতে চাকরী করতেন নাকি। কাজেই, এ গল্পের সত্যি-মিথ্যে ঠিক করে বলা আজ শক্ত। কারণ ঘটনাটা ঘটেছিল প্রায় একশ বছর আগে—যাঁরা বলেছেন, তাঁরাও কেউ বেঁচে নেই আজ।

যাই হোক্—তবু গল্পটা বলছি এইজন্যে যে মোটামুটি এটা গল্পের মতই। গল্প হিসেবেই শোনা যাক্ না।

মদন জ্যাঠামশাইয়ের বাবা প্রজাপতি মুখুয্যে মাউতে কাজ করতেন তা আগেই বলেছি; কিন্তু একটা কথা বলা হয়নি এই যে, মাউতে তিনি এসেছিলেন পরে। স্যার কলিন ক্যাম্পবেল যখন ডিসেম্বর মাসে কানপুর দখল করেন তখন তাঁরই হুকুমে একদল কমিসারিয়েট কর্মচারী কানপুর থেকে মাউতে আসেন, সার হিউ রোজ সেখানে যে ঘাঁটি বসিয়েছিলেন—তার কাজ চালাবার জন্য। কাজেই বিবিগড়ের হত্যাকাণ্ড যখন হয় তখনও তিনি কানপুরে আছেন।

কানপুর গ্যারিসনকে নিরাপদে নৌকা করে এলাহাবাদে চলে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও নানা সাহেব পরে তা রাখতে পারেননি, পাড় থেকে গোলা ছুঁড়ে নৌকাগুলো ডুবিয়ে দেওয়া

হয়েছিল—এজন্য সকলেই সিপাইদের, বিশেষ করে নানা সাহেব ও তাঁতিয়া টোপীকে দোষ দেয়। কিন্তু প্রজাপতি বলতেন যে ওঁদের কোন দোষ ছিল না। ওঁরা সরল ভাবেই হুইলার সাহেবকে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই দিনই এলাহাবাদ থেকে খবর এসে পৌঁছল যে কাশী ও এলাহাবাদে বিদ্রোহী সিপাইদের দমন করবার পর ইংরেজরা সেখানকার বাসিন্দাদের ওপর যে অত্যাচার করেছে তা অকথ্য। কোন মানুষ যে কোন মানুষের ওপর সেরকম অত্যাচার করতে পারে, তা চোখে দেখলেও বিশ্বাস হওয়া শক্ত—কানে শুনলে ত হয়ই না। তবু, একের পর এক লোক যখন বললে যে, তারা চোখে দেখেই এসেছে, নিরীহ গ্রামবাসী বা শহরবাসীদের ওপর কী অকথ্য অত্যাচার হয়েছে—বৃদ্ধ বালক স্ত্রীলোক কেউ বাদ যায়নি, তখন সিপাইরা সব ক্ষেপে উঠল প্রতিরোধের জন্য। যারা এ কাজ করছে তাদেরই ভাইবেরাদাররা নিরাপদে চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবে? কখনও না। নানা সাহেব ও তাঁতিয়া টোপী অনেক বোঝালেন, বললেন যে তাঁরা ওদের কথা দিয়েছেন সিপাইদের সেনাপতি হিসাবেই—কথার খেলাপ হলে বড় অন্যায় হবে ইত্যাদি। তাতে কতকটা শান্ত হলো সবাই কিন্তু তাঁতিয়া বুঝলেন এ বাহ্য শান্তি, এর ভিদ্ মোটেই শক্ত নয়।

তবু, তখন আর সময় নেই। নৌকা প্রস্তুত, সাহেবরা উঠছে। মেয়েদের ও শিশুদেরও নিয়ে যেতে চায় ওরা। তাঁতিয়া টোপী হঠাৎ বললেন, 'মেয়েরা থাক্।'

হুইলার সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কেন?'

তাঁতিয়া বললেন, 'কী জানি, আমি ভাল বুঝছি না। এদের মন ক্ষিপ্ত হয়ে আছে—কি করে বসবে তা কে জানে? ওঁরা থাকুন, আমি বন্দী করে রাখার নাম করে আট্‌কে রাখছি। সুযোগ বুঝে আমি নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেবো।'

হুইলার আর কি বলবেন! বললেন, 'আপনি কথা দিচ্ছেন যে ওদের—'

সেকথা শেষ করতে না দিয়েই তাঁতিয়া বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই! আমি ব্রাহ্মণ, যতক্ষণ আমার কোন হাত থাকবে, স্ত্রীলোক আর শিশুর ওপর কোন অত্যাচার হবে না।'

তাঁতিয়া নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এক নবাবের খালি প্রাসাদে মেয়েদের পাঠিয়ে দিলেন; সিপাইদের বলে দিলেন, 'খুব কড়া নজর রাখবে—খবরদার কোন মতে না কেউ পালায়।'

তিনি জানতেন যে ঐভাবে না বললে সিপাইদের হাত থেকে ওঁদের বাঁচানো শক্ত হবে। সেই থেকে ঐ প্রাসাদটির নাম হয়ে গেল বিবিগড়, যেখানে বিবিরা থাকেন!

এবার সাহেবরা সবাই প্রায় নৌকায় উঠেছে—কতকগুলো ছেড়ে মাঝ-গঙ্গায় গেছে, কতকগুলো ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময় আবার নতুন খবর নিয়ে একদল লোক এল এলাহাবাদ থেকে—'জানো, এই কুত্তারা কাশীতে কি করেছে? শিশুদের কেটেছে মার চোখের সামনে, স্ত্রীর চোখের সামনে স্বামীর মুণ্ড নিয়ে বল খেলেছে—যারা কোনও অপকার করেনি, যারা এ লড়াইয়ের বিন্দুবিসর্গও জানে না, তাদের ওপর এই অত্যাচার! আর তোমরা এই শূয়োরদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করছ?'

ব্যস্! সত্যি-মিথ্যে বিচার করার তখন সময় নেই, অগ্র-পশ্চাৎ কে ভাববে? চোখের সামনে তখন খুন জেগেছে ওদের! নানা ও তাঁতিয়ার ক্ষীণ চেষ্টা সে প্রবল বন্যায় কোথায় ভেসে গেল!

মাত্র চারজন ইংরেজ প্রাণ নিয়ে সেদিন পালিয়ে যেতে পেরেছিল। দেখা গেল তাঁতিয়ার অনুমানই ঠিক! কিছুক্ষণ পূর্বের শান্তিটা ছিল বাহ্য।

এরপর না রইল তাঁতিয়ার তিলমাত্র অবসর, আর না রইল নানা সাহেবের। আগুন জ্বলেছে কিন্তু অনুকূল বাতাস নেই। সবাই ইংরেজদের দিকে। রাজপুতরা, শিখরা, গুর্খারা, এমন কি মারাঠা-রাজারাও ইংরেজদের সাহায্য করছেন। জনসাধারণ প্রাণহীন, তাদের যেন কিছুই এসে-যায় না, কে হারল আর কে জিতল সে খোঁজে! এই দারুণ প্রতিকূলতা ও নিস্পৃহতার সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে ওঁদের দিনরাত। যাদের নিয়ে এ কাজ করছেন, তারাও এর গুরুত্ব বোঝে না! এমন এক এক হঠকারিতা করে বসে যে, সাধারণ লোকের বিরূপতা আরও বেড়ে যায়। এই বিপদের সামনে দাঁড়িয়েও কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। বিপদ-বিসম্বাদ লেগেই আছে।

এইভাবে তাঁতিয়া এখন চারিদিক থেকে এমন বিব্রত হয়ে উঠলেন যে বিবিগড়ের বন্দিনীদের কথা তাঁর মনেই রইল না। কিন্তু যাদের ওপর ভার ছিল ওদের পাহারা দেওয়ার, তারা ব্যস্ত হয়ে উঠল। চারিদিকে গৌরব অর্জনের নানা পথ খোলা,

নিজেদের কর্তৃত্ব করবার অসংখ্য উপায় চারিদিকে—আর তারা কতকগুলো ছেলেমেয়েকে পাহারা দিতে এখানে বসে থাক্‌বে? বিশেষত যারা ওদের চিরশত্রু? তাছাড়া খাদ্যখাবারের যে রকম টান, অতগুলো মেম-সাহেবকে বসিয়ে খাইয়ে লাভ কি?

জমাদার ইন্দ্রপাল সিং রোজ হাঁটাহাঁটি করে, 'গুরুজী, হুকুম দিন ওদের শেষ করে দিই। আর কতদিন এমন করে আমরা বসে থাকব?'

তাঁতিয়া ওদের বিরুদ্ধ-মনোভাব বুঝে কেবলই দিন পেছিয়ে দেন, 'সময় হলেই বলব ইন্দর পাল—আর দুদিন সবুর করো।'

অবশ্য অবসর এর ভেতর যে মেলেনি তা নয়—কিন্তু তাঁতিয়ারও ত সহস্র ঝঞ্ঝাট!

এমনি করে হঠাৎ একদিন, ১৪ই জুলাই সন্ধ্যাবেলা ইন্দ্রপাল আবার এলো। তাঁতিয়া তখন নানা, এবং আরও অন্যান্য প্রধানদের সঙ্গে গুরুতর মন্ত্রণা করছেন। চারিদিকে বিপদ আসন্ন—কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লে চারিদিক থেকে যেসব সাহায্য তাঁরা পাবেন ভেবেছিলেন, তার একটাও পাচ্ছেন না, বরং ইংরেজরাই একটু একটু করে শক্তিসঞ্চয় করছে। দুশ্চিন্তার শেষ নেই, কোনদিকে পথ দেখতে পাচ্ছেন না—এমন সময়ে ইন্দ্র পালের সেই এক প্রস্তাব, 'কী করব বলুন গুরুজী!'

তাঁতিয়া বিরক্ত হয়ে বললে, 'দোহাই তোমার ইন্দর পাল, আমাদের একটু রেহাই দাও—'

'কথা একটা বলেই দিন না গুরুজী!'

'যা খুশী করো। শুধু আমাকে আর বিরক্ত করো না।'

তারপর সেকথা ভুলেই গেলেন তাঁতিয়া। পরের দিন সন্ধ্যার সময় ভয়াবহ খবর এসে পৌঁছল—স্ত্রীলোক শিশু প্রায় কেহই বাঁচেনি। সবাইকে হত্যা করে ইন্দ্রপালের লোক এক বিরাট কূয়ার মধ্যে ফেলেছে—শুধু মৃতদেহে সে কূয়া ভর্তি হয়ে গেছে।

তখনই তিনি বিবিগড়ে ছুট্‌লেন। সত্যিই ভয়াবহ। ভয়াবহ শুধু নয়—পৈশাচিক সে হত্যালীলা দেখে তিনি শিউরে উঠলেন। ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে চেয়ে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

কিন্তু জানতেন যে ক্ষমা নয়—বিচারই আসবে সেখান থেকে। তিনি সিপাইদের দিকে চেয়ে বললেন, 'আর তোমাদের জয়ের কোন আশা রইল না—এই পাপেই ভারতের স্বাধীনতা সুদূরপরাহত হয়ে গেল।'

প্রজাপতি বলতেন, এরপর থেকে তাঁতিয়ার মনে একতিলও আর শান্তি রইল না। কাজ করেন, যুদ্ধ করেন, মন্ত্রণা দেন—সবই কলের পুতুলের মত! কী একটা যেন অন্যমনস্ক ভাব! সর্বদাই যেন কি চিন্তা করেন! বাইরের দিকে কিসের শব্দে যেন কানপেতে থাকেন!

এক একটা পরাজয় হয় আর তাঁতিয়ার মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে ওঠে! সূক্ষ্ম, কুটিল হাসি—কেউ সে হাসির কোন অর্থ খুঁজে পায় না। বেতোয়ার যুদ্ধ গেল, মোরারের যুদ্ধ গেল, কোটার যুদ্ধ গেল—সর্বত্রই ঐ এক হাসি!

লক্ষ্মীবাই অনুযোগ করেন, ধুন্দুপন্থ অনুযোগ করেন,

আজিমুল্লা অনুযোগ করেন—'যুদ্ধে তোমার মন নেই গুরুজী, এ কি ছেলেখেলা করছ?'

তাঁতিয়া হেসে বললেন, 'যুদ্ধে সত্যিই আমার মন নেই। আমি যে পরাজয়ের দিকেই কান পেতে আছি। এ শুধু কর্তব্য পালন করা বৈ ত নয়! ফল যে কী হবে তা আমি জানিই।'

তারপর সে পরাজয় সত্যিই হলো—চারিদিক থেকে সর্বতোভাবে। লক্ষ্মীবাই মারা গেলেন, নানাসাহেব পলাতক, কুলওয়ার সিং নিহত, রাও সাহেব ধরা পড়েছেন—বন্ধু বলতে, সহকর্মী বলতে কেউ নেই। সারা ভারত আবার ইংরেজদের হাতে। তবু তাঁতিয়া মাতৃভূমির নামে শপথ করেছেন, দেহে যতদিন প্রাণ থাকবে তিনি চেষ্টা ছাড়বেন না। তাই আশা কিছু না থাকলেও বাইরে আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ান, এক জমিদারের কাছ থেকে আর এক জমিদারের কাছে। তারা সবাই ওঁকে শ্রদ্ধা করে, গুরুজী বলে—তাই ধরিয়ে দেয় না, কিন্তু সাহায্য? আর না। তাদের ঢের শিক্ষা হয়েছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে আর নয়।

তবু তাঁতিয়া ভেঙ্গে পড়েন না। সে শিক্ষা তাঁর নেই। তিনি জানেন, একটি লোক যদি সত্যিই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করে লেগে থাকে ত তাই যথেষ্ট, যে আগুন নিভেছে সে আগুনই আবার জ্বালিয়ে তুলতে পারবে নিজের প্রাণের বহ্নিতে।

কিন্তু এবারে এক নূতন উপসর্গ দেখা দিল। রাত্রে তিনি ঘুমোতে পারেন না। যে বিবিগড়কে প্রায় ভুলে এসেছিলেন

এতদিনে, সেই বিবিগড়ই আবার নূতন করে তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠল। রাত্রে ঘুমুলেই স্বপ্ন দেখেন সেই বীভৎস দৃশ্য—সকালে জাগ্রত অবস্থাতেও, পূজা করবার সময় ধ্যানে বসলে নিজের ইষ্টদেবতার মূর্তির বদলে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে বিবিগড়ের সেই বিকৃত শবদেহগুলি!

তাঁতিয়া বুঝলেন—তাঁর সময় হয়েছে। আর নয়।

কী করবেন? আত্মহত্যা? যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেবেন?

না, তাতে ত তাঁর প্রায়শ্চিত্ত হবে না। ইংরেজদের হাতেই তাঁকে শাস্তি নিতে হবে যে!

শেষ আশ্রয় নিয়েছেন তখন সিন্ধিয়ার সামন্ত মানসিংহের কাছে। মানসিংহ বললেন, 'ইংরেজরা চারিদিকে সহস্র চর রেখেছে গুরুদেব, এখানে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। পালান।'

'তোমার কাছে একটা অনুরোধ আছে মানসিংহ, শেষ অনুরোধ!'

'ইংরেজদের বিরুদ্ধে যাওয়া ছাড়া যা বলবেন তাই শুনব।'

'শুনবে ত?'

'হ্যাঁ—আপনার পা ছুঁয়ে শপথ করছি।'

'তবে আমাকে ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দাও।'

মানসিংহের অনুরোধ উপরোধ অনুনয় কিছুই শুনলেন না তাঁতিয়া। মানসিংহ বললেন, 'আপনি নিজেই ধরা দিন না!'

'না। সে আমি পারব না। ঝাঁসির রাণীর কাছে শপথ আছে। তা ছাড়া তাতে তোমার বিপদ বাড়বে। আর এতে তুমি পাবে পুরস্কার।'

অগত্যা মানসিংহ ইংরেজ কর্তাদের কাছে খবর পাঠালেন, তাঁন্তিয়া ধরা পড়েছে, তিনিই বুদ্ধি করে ধরেছেন। ওঁরা যেন ব্যবস্থা করেন এখনই।

ইংরেজদের হাজতে গিয়ে তাঁন্তিয়া বহুদিন পরে শান্তিতে ঘুমোলেন।

—শেষ—